আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ
fatwaa.org

ফাতওয়া নাম্বার: ১৭ প্রকাশকালঃ ০৮ মে, ২০২০ ইং

করোনা মহামারি : মসজিদ, জুমআ ও জামাআতের পাবন্দি—শরিয়াহর নির্দেশনা

প্রিয় পাঠক! fatwaa.org সাইটটির শুভ সূচনা হয় বিশ্বে এবং বাংলাদেশে লকডাউন শুরু হওয়ার বেশ পরে। ইতিমধ্যে মসজিদ, জুমআ ও জামাআতেও বিধি-নিষেধ চলে এসেছে। একই সঙ্গে এ বিষয়ে দেশ-বিদেশের উলামায়ে কেরামের অনেক মতামতও সামনে এসেছে। ভাবছিলাম, সাইটের সূচনালগ্নেই আমরা এ বিষয়ে একটি ফাতওয়া প্রকাশ করব কি না! পরে অন্য বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে তা আর সিদ্ধান্তে পরিণত হয়নি। কিন্তু গত কয়েক দিনে, এ বিষয়ে প্রিয় পাঠক ভাইদের বেশ কিছু প্রশ্ন চলে এসেছে। বিষয়টি নতুন। তাছাড়া তাতে সময়ের উলামায়ে কেরামের মতামতেও ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে। তথাপিও আমরা অল্প সময়ে, সকলের মতামত সামনে রেখে একটি সংক্ষিপ্ত ফাতওয়া তৈরি করার চেষ্টা করেছি। তাতে আশা করি, প্রশ্নকারী সকল ভাই তাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আজ ফাতওয়াটি প্রকাশের দিনই বাংলাদেশ সরকার মসজিদ থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তবুও আমরা ফাতওয়াটি প্রকাশ করলাম। আশা করি, তাতে পাঠক উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। ফাতওয়াটি প্রস্তুতে আমার চেয়েও বেশি শ্রম ও সময় দিয়েছেন আমাদের এক প্রিয় ভাই; যাঁর মতো অনেক ভাই আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেকে প্রকাশ করার চেয়ে মূল্যবান বীজের মতো নিজেকে মাটিচাপা দিয়ে রাখাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা প্রিয় ভাইয়ের ইলম ও আমল, ইহকাল ও পরকাল আপন নুরে ভরপুর করে দিন। পৃথিবীকে আল্লাহর নুর দিয়ে দেখার ও বোঝার তাওফিক দিন।

প্রশ্ন করেছেন যথাক্রমে ১. হাসনাইন মুহাম্মাদ, নেত্রকোণা; ২. আবু উবাইদাহ; ৩. সাব্বির আহমাদ; ৪. বিপ্লব, গাজিপুর; ৫. সামাদ। —আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী

* * *

প্রশ্ন:

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। মুহতারাম শায়খ! আশা করি, আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, করোনা ভাইরাসের ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতির কারণে বলতে গেলে সারা দুনিয়া লকডাউনে আবদ্ধ হয়ে আছে। অত্যধিক জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বের হতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আলোচ্য ভাইরাসটিতে যেহেতু সংক্রমণের ব্যাপার আছে, তাই সব ধরনের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি সংক্রমণ আশঙ্কায় মসজিদে জামাআতে সালাত আদায় ও জুমআর ওপরও বড় রকমের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। হারামাইন শরিফাইনসহ গোটা সৌদি আরব, মিশর ও পাকিস্তানসহ বলতে গেলে মুসলিম বিশ্বের সকল রাষ্ট্রে এ নিষেধাজ্ঞা চলছে। বাংলাদেশেও মসজিদে জুমআ ও জামাআতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে। গত ৬ই এপ্রিল ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে "প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে সর্বসাধারণকে ইবাদত/উপাসনা নিজ নিজ ঘরে পালনের নির্দেশ" শিরোনামে এ নিষেধাজ্ঞার কথা জানানো হয়। সেখানে বলা হয়েছে,

"ইতিমধ্যে মুসলিম স্কলারদের অভিমতের ভিত্তিতে পবিত্র মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারাসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশের মসজিদে মুসল্লিদের আগমন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সকলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলো :

১. ভয়ানক করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে মসজিদের ক্ষেত্রে খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমগণ ব্যতীত অন্য সকল মুসল্লিকে সরকারের পক্ষ থেকে নিজ নিজ বাসস্থানে সালাত আদায় এবং জুমআর জামাআতে অংশগ্রণের পরিবর্তে ঘরে জোহরের সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।

২. মসজিদে জামাআত চালু রাখার প্রয়োজনে সম্মানিত খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেম মিলে পাঁচ ওয়াক্তের সালাতে অনধিক ৫ জন এবং জুমআর জামাআতে অনধিক ১০ জন শরীক হতে পারবেন। জনস্বার্থে বাহিরের মুসল্লি মসজিদের ভেতরে জামাআতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।"

শেষে বলা হয়েছে,

"উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো। কোনো প্রতিষ্ঠানে উক্ত সরকারি নির্দেশ লংঘিত হলে প্রশাসন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।"

এই পরিস্থিতিতে জানার বিষয় কয়েকটি : এক. সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে শরিয়াহ এ ব্যাপারে কী বলে? দুই. বর্তমান পরিস্থিতিতে জুমআ পড়ব নাকি জোহর পড়ব? তিন. জুমআ পড়লে কীভাবে পড়ব? আজান, ইকামত ও খুতবা ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিলে ভালো হতো। চার. জোহর পড়লে কীভাবে পড়ব? জামাআতের সাথে, না একাকী? আল্লাহ তাআলা আপনাদের তাওফিক দান করুন। আপনাদের খেদমতগুলো কবুল করুন এবং জাযায়ে খায়র দান করুন। আমিন।

নিবেদক

হাসনাইন মুহাম্মাদ

নেত্রকোণা

উত্তর :

ওয়াআলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ!

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه.

أما بعد

ভূমিকা : সংক্রমণ ও মহামারি সম্পর্কে ইসলামের আকিদা

সরকার জুমআ ও জামাআতের ওপর যে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, তা ঠিক হয়েছে কি না? করোনা মহামারিকে ভিত্তি করে এরকম আরও যতগুলো শরয়ি প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, সবগুলোর ভিত্তি হচ্ছে এ কথার ওপর যে, করোনা একটি সংক্রামক ব্যাধি। সুতরাং এ বিষয়ক প্রশ্নগুলোর সমাধান পরিষ্কার করে বোঝার জন্য, আমাদেরকে প্রথমে রোগের সংক্রমণ সম্পর্কে ইসলামের আকিদা কী এবং ইসলাম মানুষকে এ বিষয়ে কী নির্দেশনা দেয়, তা পরিষ্কার হওয়া জরুরি। এ জন্য মূল উত্তরে যাওয়ার আগে আমরা এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

এক. মহামারি বান্দার গোনাহের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা আজাব

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ مَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ – الشورى 30

“তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।” -সুরা শুরা (৪২): ৩০

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ – الروم 41

“মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যেন তাদেরকে তাদের কিছু কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান। যাতে তারা (পাপাচার থেকে) ফিরে আসে।” – সুরা রূম (৩০): ৪১

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন,

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطّ، حَتّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلّا فَشَا فِيهِمُ الطّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلّا أُخِذُوا بِالسّنِينَ، وَشِدّةِ الْمَئُونَةِ، وَجَوْرِ السّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلّا سَلّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخَيّرُوا مِمّا أَنْزَلَ اللهُ، إِلّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. –سنن ابن ماجه، رقم: 4019؛ ط. الرسالة، ت: شعيب الأرنؤوط، قال الشيخ الأرنؤوط رحمه الله تعالى: حسن لغيره. اهـــ

“(১) যখন কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে; এমনকি তারা সেগুলো প্রচার করতে থাকবে, তখন তাদের মধ্যে ‘তাউন’ (প্লেগ) মহামারি আকারে দেখা দেবে এবং এমন সব ব্যাধি ও কষ্ট ছড়িয়ে পড়বে, যা আগের মানুষদের মাঝে দেখা যায়নি।

(২) যখন কোনো সম্প্রদায় ওজন ও মাপে কম দেবে, তখন তাদের ওপর নেমে আসবে দুর্ভিক্ষ, কঠিন সঙ্কীর্ণতা ও শাসকের জুলুম-অত্যাচার।

(৩) যখন কোনো কওম তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করবে না, তখন তাদের প্রতি আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। যদি জন্তু-জানোয়ার না থাকত, তাহলে আর বৃষ্টিপাত হতো না!

(৪) যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর কোনো বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেবেন, তারা তাদের সহায়-সম্পদ ছিনিয়ে নেবে।

(৫) যখন কোনো সম্প্রদায়ের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবে না, আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানসমূহের কিছু গ্রহণ করবে আর কিছু ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাদেরকে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদে জড়িয়ে দেবেন।" -সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০১৯, হাদিসটি হাসান লি-গাইরিহি

আমরা সকলেই জানি, উপরিউক্ত অপরাধগুলোর একটিও এমন নেই, যেটি আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে চলছে না। অমুসলিমরা তো করছেই, সঙ্গে আমরা মুসলিমরাও যেন তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসব অপরাধ আইন করে রাষ্ট্রীয় বৈধতা দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জামাআতবদ্ধ হয়ে মহাসমারোহে করে যাচ্ছি। আরও অতিরিক্ত মাত্রা হলো, সেগুলোকে আমরা অন্যায় তো মনে করছিই না; বরং কেউ তা অন্যায় মনে করলে,

তাকেও শাস্তির মুখোমুখি করছি। আল্লাহর সঙ্গে এবং ইসলামের সঙ্গে এর চেয়ে বড় দ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন আর কী হতে পারে?

এরকম আরও অনেক হাদিস ও আয়াত আছে, যেগুলো থেকে এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, এসব আজাব-গজব একমাত্র মানুষের গোনাহ ও পাপাচার, অন্যায় ও অনাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আপতিত হয়। অবশ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ-আপদ আসার আরেকটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহর পরীক্ষা। আল্লাহ বিপদ দিয়ে দেখতে চান, বান্দা ধৈর্য ধারণ করে কি না, তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে কি না? এর ফলে আল্লাহ তাঁর বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান। তবে এরকম পরীক্ষার বিপদ-আপদ সম্ভবত আমাদের মতো পাপীদের জন্য নয়। সেটি তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য, যারা তাঁর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত।

আমাদের প্রধান করণীয়

সুতরাং করোনার মহামারি থেকে মুক্তি পেতে হলে, এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান করণীয় হলো, সকল পাপাচার ছেড়ে, তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে আযাব থেকে মুক্ত করতে চান, তাহলে তাতে আক্রান্ত করার সাধ্য পৃথিবীর কারো নেই। পৃথিবীতে ভালো মন্দ যা হয়েছে, হয় এবং হবে, সবই আল্লাহর নির্দেশেই হয় এবং হবে। ব্যতিক্রম করার সাধ্য সৃষ্টিজগতের কারো নেই। সুতরাং আমরা যদি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি, অবশ্যই তিনি এই মহামারিসহ সকল বিপদ আপদের হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন। তিনি কারো প্রতি জুলম করেন না। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33). الأنفال

"আল্লাহ এমন নন যে, ইসতিগফার করতে থাকলে তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।" –সূরা আনফাল (৮): ৩৩

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11). التغابن

"আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোনো বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" –সূরা তাগাবুন (৬৪): ১১

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51). التوبة

"বলুন, আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তিনি আমাদের অভিভাবক। মুমিনরা আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করে।" -সূরা তওবা (৯): ৫১

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) الحديد

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের উপর যে কোনো বিপদ আসে; আমি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার পূর্বেই তা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।" –সূরা হাদিদ (৫৭): ২২

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (182). آل عمران

"এসব তোমাদের নিজ হাতের কামাই, যা তোমরা সম্মুখে প্রেরণ করেছিলে। নয়তো আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।" –সূরা আলে ইমরান (৩): ১৮২

একই আয়াতের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, সূরা আনফাল (৮): ৫১, সূরা হজ্জ (২২): ১০, সূরা ফুসসিলাত (৪১): ৪৬

যে গোনাহ যেভাবে হচ্ছে, সেই গোনাহ থেকে সেভাবেই তওবা করতে হবে। ব্যক্তিগত গোনাহের তওবা ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিক গোনাহের তওবা সামাজিভাবে, প্রকাশ্য গোনাহের তওবা প্রকাশ্যে, রাষ্ট্রীয় গোনাহের তওবা রাষ্ট্রীয়ভাবে। ব্যক্তিকে যেমন তার ব্যক্তিগত গোনাহ থেকে তওবা করতে হবে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রকেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গোনাহ থেকে তওবা করতে হবে। তওবার প্রধান রুকন হল, কৃত গোনাহ

ছেড়ে দেয়া। গোনাহকে গোনাহের জায়গায় রেখে, সারা জীবন তওবা করলেও তা ক্ষমা হবে না। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18). النساء

“তাওবা তো কবুল করবেন আল্লাহ সেসব লোকের, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে। এরাই হল সেসব লোক, যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

এমন লোকদের কোনো ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে, আমি এখন তওবা করছি। আর ক্ষমা নেই তাদের জন্যও, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। এরূপ লোকদের জন্য তো আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।” –সূরা নিসা (৪): ১৭-১৮

সুতরাং সমাজের উপর সমাজপতিদের অন্যায় অনাচার, অশ্লীল গান, সিনেমা, কনসার্ট, নাটক, জুয়া, মদ, নাস্তিকতা, ইসলাম বিদ্বেষের প্রচার প্রসারসহ যাবতীয় যত অপকর্ম সামাজিকভবে হচ্ছে, সকলকে সেগুলো ছেড়ে তওবা করে আল্লাহর কাছে, তাঁর বিধানের কাছে ফিরে আসতে

হবে। একইভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে মদ, জুয়া, সুদ, ব্যভিচার ইত্যাদির মতো জঘন্যতম অপরাধের বৈধতা প্রদান, মাজলুম ও নিপীড়িত মুসলিমদের ছেড়ে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ, আল্লাহর আইন ও বিধি বিধান পরিহার করে মানব রচিত আইনে রাষ্ট্র শাসন ও বিচার কার্য সম্পাদন ইত্যাদির মতো সকল জঘন্য পাপকর্ম ছেড়ে তওবা করে আল্লাহর আইন ও বিধি বিধান গ্রহণ করতে হবে। এগুলো আপন জায়গায় বহাল রেখে সারা জীবন তওবা করলে এবং দোয়া করলে, তওবা ও দোয়ার আহ্বান জানাতে জানাতে মৃত্যু বরণ করলেও কোনো কাজ হবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোনো ওয়াদা নেই।

হ্যাঁ, এক সময় করোনার মহামারি হয়তো আল্লাহ উঠিয়ে নিবেন, কিন্তু নতুন রূপে এর চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর আরেক মহামারি আসবে। অথবা এই দুনিয়ায় আল্লাহ আমাদের মতো জঘন্য কোনো পাপীকে হয়তো ঢিল দেবেন এবং ছেড়েও দিবেন। কিন্তু তা হবে তার জন্য আরো ভয়ঙ্কর বিষয়। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42). ابراهيم

“জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করো না। তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে।” –সূরা –ইবরাহীম (১৪): ৪২

যেদিন আপন সন্তানকে মুক্তিপণ দিয়েও রেহাই পাওয়া যাবে না!

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16). المعارج

“যেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মতো এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গিন পশমের মতো। (সুহৃদ) বন্ধু (অপর) বন্ধুর খবর নিবে না; যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। অপরাধী সেদিনকার আযাব থেকে রক্ষা পেতে (সহজেই) মুক্তি পণ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে। তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে। তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। বরং (সম্ভব হলে) পৃথিবীর সবকিছুকেই। অতঃপর চাইবে নিজেকে রক্ষা করতে। (কিন্তু) না, (কোন কিছুর বিনিময়েই সেদিনকার আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।) তা তো লেলিহান অগ্নি। যা দেহ থেকে চামড়া খসিয়ে দেবে।” –সূরা মাআরিজ (৭০): ৮-১৫

শামের গভর্ণর মুয়াজ রা.র নির্দেশনা

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মহামারিতে শামের গভর্ণর আবু উবায়দা রা. মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যু শয্যায় তিনি মুআয রা.কে পরবর্তী গভর্ণরের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। দায়িত্ব নিয়ে তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন। যাতে তিনি সকলকে গোনাহ ছেড়ে, মানুষের হক আদায় করে আল্লাহমুখী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

أيها الناس! توبوا إلى الله توبة نصوحًا، فليس من عبد يلقى الله وهو غير تائب من ذنبه إلا كان حقيقًا على الله أن لايغفر له إلا أن تتداركه الرحمة، وانظروا! من كان عليه منكم دين فليقضه، فإن العبد مرتهن بدينه، ومن أصبح منكم مهاجرًا لأخيه المسلم فليلقه وليصافحه، فإنه لاينبغي للمؤمن أن يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام –الفتوح لابن أعثم الكوفي (ت:314هـ)، ج: 1، ص: 238-239، ط. دار الأضواء

“লোক সকল! আল্লাহ তাআলার কাছে খালেস দিলে তওবা করে নাও। তওবা না করে যে ব্যক্তি মারা যাবে, সে এর উপযুক্ত যে, আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করবেন না। হ্যাঁ, আল্লাহর রহমত হলে ভিন্ন কথা। তালাশ করে দেখ, কারো কাছে কারো পাওনা থাকলে সে যেন তা পরিশোধ করে দেয়। কেননা, বান্দা ঋণের কারণে আটকা পড়ে থাকবে। যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল, সে যেন তার সাথে সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করে। কোনো মুমিনের উচিৎ নয়, তিন দিনের বেশি তার ভাইকে পরিত্যাগ করে থাকা।” –আলফুতুহ লিইবনি আ’সাম (৩১৪হি.): ১/২৩৮-২৩৯

দুই.

আকিদার দ্বিতীয়াংশ

হাদীসে এসেছে,

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا عدوى). فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم (فمن أعدى الأول) -صحيح البخاري، رقم: 5439؛ ط. دار ابن كثير، اليمامة – بيروت؛ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সংক্রমণ বলতে কিছু নেই'। তখন এক বেদুঈন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে এমন কেন হয় যে, বালু ময়দানে উটের পাল চরতে থাকে, যেন সেগুলো হরিণের মতো (সুস্থ, সবল ও সতেজ)। তখন একটি পাঁচড়ায় আক্রান্ত উট আসে। ফলে বাকি উটগুলো আক্রান্ত হয়ে পড়ে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে প্রথমটিকে কে আক্রান্ত করল?" –সহীহ বুখারি: ৫৪৩৯

উক্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার বললেন, সংক্রমণ বলতে কিছু নেই। বেদুঈন সাহাবি যখন সংক্রমণের একটি উদাহরণ দিয়ে আপত্তি করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একটি যৌক্তিক জবাব দিলেন যে, রোগ যদি সংক্রমণেই হত, তাহলে প্রথমটিকে কে আক্রান্ত করল? সে তো কোনো রুগ্ন উটের সংশ্রবে যায়নি! সাহাবিও বুঝে গেলেন এবং উত্তর পেয়ে শান্ত হয়ে গেলেন।

অপর এক হাদীসে এসেছে,

عن جابر: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة، وقال: "كل، ثقة بالله وتوكلا عليه" -سنن ابي داود، رقم:

3925؛ ط. دار الرسالة العالمية، ت: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي، قال الشيخ الأرنؤوط رحمه الله تعالى: إسناده ضعيف. اهـــ

“জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তির হাত ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খাবারের পাত্রে রাখলেন এবং বললেন, আল্লাহর উপর আস্থা রেখে এবং তাঁর উপর ভরসা করে খাও।” –সুনানে আবু দাউদ: ৩৯২৫[১]

এই হাদীস থেকেও প্রথমোক্ত হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায় এবং সংক্রমণ নেই বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কিন্তু কিছু হাদীসে এর ব্যতিক্রমও এসেছে। এমনকি সহীহ বোখারীর একটি হাদীসেরই প্রথমাংশে এবং শেষাংশে বাহ্যত দুই রকম নির্দেশনা এসেছে। আবু হোরায়রা রা. বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. صحيح البخاري: 5707

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সংক্রমণ বলতে কিছু নেই। কুলক্ষণ বলেও কিছু নেই। পেঁচা বা সফর মাসে কোনো অশুভ লক্ষণ নেই। আর কুষ্ঠ রোগী থেকে তেমনি পলায়ন করবে, যেমন সিংহ থেকে পলায়ন কর।” –সহীহ বুখারি: ৫৭০৭

এখানে আমরা দেখছি, হাদীসটির প্রথমাংশে বলা হল, সংক্রমণ নেই। কিন্তু শোষাংশে বলা হচ্ছে, 'সিংহ থেকে যেমন পলায়ন কর, কুষ্ঠ রোগী থেকেও তেমনি পলায়ন কর।'

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন,

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ -صحيح البخاري، رقم: 5437؛ ط. دار ابن كثير، اليمامة – بيروت؛ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا

"অসুস্থ উটের মালিক যেন রোগাক্রান্ত উটগুলোকে (অন্যের) সুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত না করে।" –সহীহ বুখারি: ৫৪৩৭

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন,

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها -صحيح البخاري، رقم: 5396؛ ط. دار ابن كثير، اليمامة – بيروت؛ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا

"কোনো ভূমিতে 'তাউন' (প্লেগ) দেখা দিয়েছে শুনলে, তাতে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা কোনো ভূমিতে থাকাবস্থায় যদি সেখানে দেখা দেয়, তাহলে সেখান থেকে বের হবে না।" –সহীহ বুখারি ৫৩৯৬

দ্বিতীয়োক্ত হাদীসগুলোতে আমরা দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে। সংক্রামক রোগী থেকে

দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলেছেন, একইভাবে ব্যক্তির অবস্থান যেখানে থাকে, সেখানে এমন মহামারি দেখা দিলে অন্যত্র যেতে বারণ করেছেন।

উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীসগুলোর সমন্বয় সাধনে কয়েকটি কথা বলেছেন,

১. যে হাদীসগুলোতে সংক্রমণ না থাকার বিষয়টি এসেছে, সেগুলোর অর্থ হচ্ছে, রোগ নিজ থেকে কাউকে আক্রান্ত করার সক্ষমতা রাখে না যে, রোগীর সংস্পর্শে গেলেই আক্রান্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বরং আক্রান্ত হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণই আল্লাহর ফায়সালার উপর নির্ভর করে। তিনি যাকে আক্রান্ত করার ইচ্ছা করেন, রোগীর সংস্পর্শ ছাড়াই আক্রান্ত করেন, যেমনিভাবে প্রথম ব্যক্তিকে আক্রান্ত করেন। আর যাকে ইচ্ছা রোগীর সংস্পর্শে থাকার পরও মুক্ত ও নিরাপদ রাখেন। এ কারণেই দেখা যায়, কেউ অনেক দিন ধরে আক্রান্ত রোগীর সংশ্রবে থেকে, তার সেবা শুশ্রূষা করেও আক্রান্ত হয় না। আবার কেউ জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপ কিংবা সমুদ্রে ভাসমান রণতরীতেও আক্রান্ত হয়।

এ হল সংক্রমণ সম্পর্কে ইসলামের পরিষ্কার আকিদা এবং একজন মুমিনের আকিদা। পক্ষান্তরে জাহেলি যুগের আকিদা ছিল, রোগ নিজ থেকেই কাউকে আক্রান্ত করার সক্ষমতা রাখে। আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত তাদের এই আকিদা প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রথমোক্ত হাদীসে পরিষ্কার নিষেধ করেছেন, এমন সংক্রমণ বলতে কিছু নেই। কারণ সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়।

২. তবে পৃথিবী দারুল আসবাব তথা উপায় উপকরণের জগত। বাস্তবে যদিও সব কিছু আল্লাহই করেন, কিন্তু তিনি সব কিছুকেই বাহ্যিক কিছু উপায় উপকরণের সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। রিযিক তিনিই দান করেন, কিন্তু তার বাহ্যিক উপায় হিসেবে বান্দাকে উপার্জনের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। রোগ থেকে তিনিই মুক্তি দেন, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণ হিসেবে বৈধ চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। একইভাবে রোগ বালাই প্রকৃত অর্থে তিনিই দেন, কিন্তু তারও বাহ্যিক কিছু কারণ থাকে। যেমন নষ্ট খাবার বা অতিরিক্ত খাবার খাওয়া বদ হজমের একটা কারণ, নোংরা থাকা খুজলি পাঁচড়া হওয়ার কারণ। এ কারণগুলো যে, শুধুই পৃথিবীর নেজাম রক্ষার জন্য এবং এগুলো যে প্রকৃত স্রষ্টা ও দাতা নয়, তার বাস্তবতা আল্লাহ আমাদের হরহামেশাই দেখাতে থাকেন। যার ফলে আমরা দেখি, অনেকে কর্ম না করেও রিযিক পায়, চিকিৎসা না করেও সুস্থ হয়, আবার অনেকে কর্ম করেও খেতে পায় না, চিকিৎসা করেও সুস্থ হয় না। অনেকে নষ্ট খাবার ও অতি মাত্রায় খেয়েও বদ হজমের শিকার হয় না, নোংরা থেকেও খুজলি পাঁচরা থেকে মুক্ত থাকে, আবার অনেকে এগুলো থেকে সতর্ক থেকেও রোগাক্রান্ত হয়।

সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে সংক্রমণও আক্রান্ত হওয়ার ঠিক তেমনি একটি বাহ্যিক কারণ মাত্র। রোগ সৃষ্টির বাহ্যিক কারণ হিসেবে সংক্রমণকে অস্বীকার করা হয়নি। এজন্যই দ্বিতীয়োক্ত হাদীসগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম তা থেকে দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনি নোংরা থাকা, অতিরিক্ত খাওয়া ইত্যাদির মতো অন্যান্য রোগ বালাইয়ের বাহ্যিক কারণগুলো থেকেও দূরে থাকার নির্দেশ শরীয়তে আছে।

ইমাম বায়হাকি রহ. (৪৫৮ হি.) বলেন,

ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا عدوى»، وإنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل، وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يورد ممرض على مصح»، وقال في الطاعون: «من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه»، وغير ذلك مما في معناه، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل –معرفة السنن والآثار 10\189، ط. جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي – باكستان)، دار قتيبة (دمشق –بيروت)، دار الوعي (حلب – دمشق)، دار الوفاء (المنصورة – القاهرة)

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন, ‘সংক্রমণ বলতে কিছু নেই।’ তবে এর দ্বারা জাহেলি যমানার মানুষ যে আকিদা পোষণ করত, তা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। তারা মনে করত, সংক্রমণটা গাইরুল্লাহর শক্তিতে হয়। নতুবা আল্লাহ তাআলা তার আপন ইচ্ছায় কখনো কখনো এ ধরনের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সুস্থ ব্যক্তির সংমিশ্রণটাকে তার মধ্যেও রোগ সৃষ্টি হওয়ার সবব ও কারণ বানিয়ে দেন। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘উটের মালিক যেন তার রোগাক্রান্ত উটগুলোকে (অন্য মালিকের) সুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত না করে।’ তাউন মহামারি সম্পর্কে বলেছেন, ‘কোনো অঞ্চলে দেখা দিয়েছে শুনলে, কেউ যেন সেখানে না যায়।’

এছাড়াও এ জাতীয় অন্যান্য হাদিসের একই উদ্দেশ্য। সবগুলো আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত তাকদির অনুযায়ীই হয়ে থাকে।" –মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার- বায়হাকি রহ.: ১০/১৮৯, ফাতহুল বারি- ইবনে হাজার রহ.: ১০/১৬১

৩. তাছাড়া দূরে থাকতে বলার আরেকটি কারণ উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যাদের ঈমান দূর্বল, তারা সংশ্রবে যাওয়া পর যখন আক্রান্ত হবে, তখন তাদের ঈমানের সমস্যা হতে পারে। সে ভাবতে পারে, সংক্রমণই আমাকে আক্রান্ত করেছে, যদিও বাস্তবতা হল, সে রোগীর সংস্পর্শে না গেলেও আক্রান্ত হত, যেহেতু তার ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ছিল। সুতরাং এমন ব্যক্তির ঈমানের হেফাজতের জন্য দূরত্ব বজায় রাখাই নিরাপদ। দূরে থেকে আক্রান্ত হলেও তাতে অন্তত সংক্রমণের জাহেলি আকিদা তার ঈমানকে আক্রান্ত করবে না।

আল্লামা হাসকাফি রহ. (১০৮৮ হি.) রহ. বলেন

(وإذا خرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلي به كره له ذلك) فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده وعليه حمل النهي في الحديث الشريف مجمع الفتاوى. –الدر المختار (على صدر رد المحتار) ج: 6، ص: 757، ط. دار الفكر-بيروت

"একজন 'তাউন' (প্লেগ) মহামারির এলাকা থেকে বের হতে চাচ্ছে; যদি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, সব কিছু আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির অনুযায়ীই

হয়, তাহলে যাওয়া আসা করতে কোনো সমস্যা নেই। আর বিশ্বাস যদি এমন হয় যে, বের হয়ে গেলেই বেঁচে যাবে বা ঢুকলেই আক্রান্ত হবে, তাহলে তার জন্য যাওয়া আসা মাকরূহে তাহরিমি। এমন ব্যক্তি যাবেও না, আসবেও না। যেন (আক্রান্ত হলে বা বেঁচে গেলে) তার আকিদা নষ্ট না হয়। হাদীস শরীফের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য।" –রদ্দুল মুহতারের সাথে মূদ্রিত 'আদদুররুল মুখতার' ৬/৭৫৭

একই কথা বলেছেন, হাফেজ ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.), ফাতহুল বারি: ১০/১৬০

তিন.

আসবাব ও উপায় উপকরণের সঙ্গে মুমিনের আচরণ

মুমিন যেহেতু দুনিয়ার সকল আসবাব ও উপায় উপকরণ সম্পর্কে এই আকিদা পোষণ করে, এজন্য সে সতর্কতা ও উপায় উপকরণ এই পরিমাণ গ্রহণ করে, যতটুকুর আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন। ততটুকু গ্রহণ করে সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে। আল্লাহর নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় উপায় উপকরণ সে গ্রহণ করে না। কারণ সে জানে, উপায় উপকরণ আমাকে দিতেও পারবে না, বাঁচাতেও পারবে না। দিবেন এবং বাঁচাবেন একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তাঁর নিষিদ্ধ উপকরণ অবলম্বন করে এবং তাঁকে অসন্তুষ্ট করে, আমি আমার প্রয়োজন পূরণ করতে পারব না। প্রকৃত অর্থে দিবেন যেহেতু তিনি, এজন্য আমার উদ্দেশ্য অর্জনের প্রধান হাতিয়ার হল, তাঁকে সন্তুষ্ট করা। আর তিনি যেহেতু হুকুম করেছেন, উপায় উপকরণ গ্রহণ করতে, এজন্য ততটুকুই গ্রহণ করা, যতটুকুর তিনি হুকুম করেছেন বা অনুমোদন করেছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেন,

(لا تسبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب في الحلال وترك الحرام). رواه ابن حبان في صحيحه، رقم: 3241، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح

“রিযিক বিলম্বিত ভেবে তাড়াপ্রবণ হয়ো না। কারণ কোনো বান্দাই তার রিযিক পূর্ণ গ্রহণ না করে মৃত্যু বরণ করবে না। সুতরাং রিযিক অন্বেষণের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। হালাল গ্রহণ কর, হারাম বর্জন কর।” - সহীহ ইবনে হিব্বান: ৩২৪১

পক্ষান্তরে কাফের ও দূর্বল ঈমানদারের সামনে বিষয়টি এমন থাকে না। যার কারণে তারা উদ্দেশ্য অর্জনে, আল্লাহর নিষিদ্ধ উপায় উপকরণও গ্রহণ করে এবং হারামে লিপ্ত হয়। যদিও তাতে সে তার তাকদির এক চুল পরিমাণও পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু নির্বোধ তা বুঝে না।

সংক্রমণ সম্পর্কে ইসলামি আকিদার উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে আমাদের সামনে দুটি বিষয় পরিষ্কার হল:

১. বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মতে এবং বাস্তবতায় যেহেতু দেখে গেছে, করোনা ভাইরাসটি অনেক ক্ষেত্রে (সর্বক্ষেত্রে নয় এবং সর্বদা নয়) একজন থেকে অন্যজনে সংক্রমিত হয়, তাই তা থেকে বাঁচার জন্য বাহ্যিক উপায় উপকরণগুলো আমরা গ্রহণ করব। একই সঙ্গে আল্লাহমুখী হব এবং ভরসা রাখব একমাত্র আল্লাহর রহমতের উপর। দৃঢ় বিশ্বাস রাখব, বাঁচানোর মালিক একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো কিছুই আমাকে তা

থেকে বাঁচাতে পারবে না। এভাবে উপায় উপকরণ গ্রহণ করা, তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। যেমন রিযিকের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কর্ম করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়।

২. এই সতর্কতা ততটুকুই অবলম্বন করব, যতটুকু শরীয়ত অনুমোদন দিয়েছে। যেখানে শরীয়ত অনুমোদন দেয়নি, সেখানে গিয়ে তা ছেড়ে দিব। আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেও উক্ত রোগ থেকে বাঁচার চেষ্টা করব না। এটা ঈমান পরিপন্থী এবং তাওয়াক্কুল পরিপন্থী। যেমন একজন রোগীর সেবা শুশ্রূষা এবং একজন মৃতের কাফন দাফন ফরজ। এখন আমরা যদি এমন সতর্কতা অবলম্বন করি যে, এই কাজগুলো করার জন্য কেউ তার কাছেই গেলাম না, তাহলে তা হবে সীমা লঙ্ঘন এবং সতর্কতার এমন স্তর, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। এটি প্রমাণ করবে, রোগ দেয়ার একমাত্র মালিক যে আল্লাহ, আমার এই আকিদায় ঘাটতি ও ত্রুটি আছে।

এটিই হচ্ছে মধ্যপন্থা এবং ইসলামী শরীয়াহর সৌন্দর্য। যা থেকে বিচ্যুত হওয়ার করুণ পরিণতি আজ আমরা চোখের সামনে দেখছি। একদল অবুঝ লোক দ্বীনের নামে সংক্রমণের বাস্তবতাকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। যার ফলে অজ্ঞ লোকদের কাছে ইসলাম ধর্মের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বাস্তব জীবনে ইসলাম ধর্মের প্রয়োগযোগ্যতা তাদের দৃষ্টিতে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। অপরদিকে কিছু লোক করোনা রোগকে প্রভুর মতো ভয় করছে। যার ফলে আক্রান্ত আত্মীয় স্বজনের সেবা শুশ্রূষা এবং কাফন দাফন থেকেও বিরত থাকছে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

সামনের আলোচনায় শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিন্দু খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে। কারণ এর আলোকেই নির্ণিত হবে,

সরকারের কোন পদক্ষেপগুলো কতটুকু শরীয়ত সম্মত হচ্ছে এবং কোন অংশ শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করছে। একইভাবে আমরা কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারব, আর কতটুকু পারব না।

প্রশ্ন–এক. সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে শরীয়ত এ ব্যাপারে কী বলে?

উত্তর:

সরকারের গৃহীত সতর্কতামূলক পদক্ষেপগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি

এক. ব্যবস্থাপনাগত অংশ

সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সরকারের কিংবা আমাদের সতর্কতার একটি অংশ শুধুই ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যার সঙ্গে শরীয়তের কোনো বিধানের বিশেষ সম্পর্ক নেই অথবা তা শরীয়তের কোনো বিধানকে প্রভাবিত করে না। যেমন মাস্ক পরা, বেশি বেশি হাত ধোয়া, অপ্রয়োজনে জনসমাগম এড়িয়ে চলা, জনসমাগম ও চলাচল সীমিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাস্তা ঘাট ও গাড়ি চলাচল বন্ধ করা, শপিং মল বন্ধ করা ইত্যাদি। এগুলো করার জন্য মৌলিকভাবে দুটি শর্ত পূরণ করা জরুরি।

১. এজাতীয় যে পদক্ষেপগুলো বিশেষজ্ঞরা সমষ্টিগতভাবে জন মানুষের কল্যাণ ও প্রয়োজন মনে করবেন, সেটিই সরকার করতে পারবে। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা জায়েয হবে না, যা জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর নয়।

২. একারণে যারা রোজগার চিকিৎসা বা জীবন জীবিকা কিংবা এজাতীয় জরুরি কোনো সঙ্কটে পড়বে, তাদের এ প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে, নতুবা তাদের নিজেদের ব্যবস্থা করার সুযোগ থাকলে, তার জন্য তাদেরকে সুযোগ করে দিতে হবে। এবিষয়গুলো নিয়ে আশা করি কারো মাঝে সংশয় থাকার কথা নয়। সুতরাং এখানে আমরা দালিলিক আলোচনায় গিয়ে বিষয়টি দীর্ঘ করতে চাই না।

দুই. শরীয়তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশ

শরীয়তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশ বলতে, মসজিদ খোলা রাখা, জামাতে সালাত আদায় করা, জুমআয় অংশ গ্রহণ করা, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্য মুসলিমের ওয়াজিব হক আদায় করা, রোগীর সেবা করা, মৃতের কাফন দাফনসহ এজাতীয় যে বিষয়গুলোতে শরীয়তের সুনির্দিষ্ট বিধান আছে, সেগুলোতে আমরা কতটুকু সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব এবং কতটুকু পারব না?

জানা কথা, মানুষের ওজর আপত্তি ও রোগ বালাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা থেকেই ছিল এবং এগুলো মানুষের জন্মগত ও স্বভাজাত বৈশিষ্ট্য। সাহাবায়ে কেরামের যামানা থেকে শুরু করে বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে সংক্রামক রোগ এবং মহামারিও অনেক দেখা দিয়েছে। সুতরাং বিষয়াটি আমাদের জন্য একেবারে নতুন ভাবার কোনো কারণ নেই। বরং সালাফ থেকেই আমরা এবিষয়ক নির্দেশনাগুলো পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

অসুস্থতার কারণে শরীয়ত কাদেরকে মসজিদ থেকে বারণ করেছে?

যেসব রোগীর কারণে সাধারণত অন্য মুসল্লিদের অস্বস্তি ও কষ্ট হয়, তাদেরকে মসজিদে এবং যে কোনো মজলিসে উপস্থিত হওয়া থেকে শরীয়ত বারণ করেছে। প্রথমে আমরা সংক্ষেপে হাদীস ও আসার এবং ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এমন কিছু লোকের আলোচনা তুলে ধরছি, যাদের কারণে অন্যের কষ্ট হতে পারে বিধায় মসজিদে যাওয়া থেকে বারণ করা হয়েছে।

দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খাওয়ার পর দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে যেতে বারণ করা হয়েছে

যারা কাঁচা পেয়াজ রসুন খায়, তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়াজ রসুনের দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে যেতে বারণ করেছেন।

عن أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الريح فقال « من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا فى المسجد ». فقال الناس حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال « أيها الناس إنه ليس بى تحريم ما أحل الله لى ولكنها شجرة أكره ريحها ». -صحيح مسلم، رقم: 1284؛ ط. دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـــ بيروت

“আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, খায়বার বিজয় করা মাত্রই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিরা ঐ সবজিটি অর্থাৎ রসুনের উপর ঝাপিয়ে পড়লাম। আমরা সকলেই তখন ক্ষুধার্ত। খুব খেলাম। খেয়ে মসজিদে গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্গন্ধ পেলেন। বললেন, যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধযুক্ত সবজিটির সামান্যও খায়, সে যেন আমাদের নিকটে মসজিদে না আসে!

একথা শুনে লোকে বলাবলি করতে লাগল, ‘রসুন হারাম হয়ে গেছে। রসুন হারাম হয়ে গেছে’।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে এ খবর গেল। তিনি বললেন, হে লোকসকল! আল্লাহ তাআলা আমার জন্য যা হালাল করেছেন, তা হারাম করার অধিকার আমার নেই। তবে সবজিটির দুর্গন্ধ আমি অপছন্দ করি।” –সহীহ মুসলিম ১২৮৪

عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها ». يعنى الثوم. -صحيح مسلم، رقم: 1277؛ ط. دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـــ بيروت

“যে ব্যক্তি এই রসুন খায়, দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত সে যেন আমাদের মসজিদসমূহের কাছেও না আসে।” –সহীহ মুসলিম ১২৭৭

»من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس «. –صحيح مسلم، رقم: 1280؛ ط. دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ــ بيروت

“যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধযুক্ত সবজিটি খায়, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে। কারণ, যে জিনিসের দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়, সেটি দ্বারা ফেরেশতারাও কষ্ট পায়।” –সহীহ মুসলিম ১২৮০

হযরত উমর রাদি. একদিন মিম্বারে খুতবায় বলেন,

إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم– إذا وجد ريحهما من الرجل فى المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. –صحيح مسلم، رقم: 1286؛ ط. دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ــ بيروت

“হে লোকসকল! তোমরা এ দুটি সবজি; পেঁয়াজ রসুন খাচ্ছ। আমি এ দু’টোকে অপ্রিয় মনে করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, মসজিদে কোনো ব্যক্তি থেকে এগুলোর দুর্গন্ধ পেলে, তাকে বের করে দেয়ার আদেশ দিতেন। ফলে তাকে বের করে একেবারে বাকী’ গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হত। সুতরাং কেউ যদি এগুলো খেতে চায়, সে যেন রান্না করে দুর্গন্ধ দূর করে খায়।” –সহীহ মুসলিম ১২৮৬

আরো দেখুন সহীহ মুসলিম: ১২৭৬, ১২৭৮, ১২৭৯, ১২৮৫; সহীহ বোখারী: ৮১৭। এছাড়াও এবিষয়ে আরো অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত হাদীসগুলোর আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যার মাঝে এমন কোনো সমস্যা আছে, যা নিয়ে মসজিদে গেলে অন্য মুসল্লিদের কষ্ট হবে, তাকে মসজিদে যেতে বারণ করা যাবে। একই কারণে অন্য যে কোনো মজলিস থেকেও তাকে বারণ করা যাবে।

আরো যেসব লোককে মসজিদ থেকে বারণ করা হয়েছে

একারণে কুষ্ঠ রোগীকে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা থেকে ফুকাহায়ে কেরাম বারণ করেছেন। একইভাবে কিছু লোক আছে, যাদের বদ নজর লাগে। তাদের নজরের কারণে অনেকের ক্ষতি হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

العين حق-صحيح البخاري، رقم: 5408؛ ط. دار ابن كثير، اليمامة – بيروت؛ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا

“নজর লাগা বাস্তব ও সত্য।” –সহীহ বুখারি ৫৪০৮

তাদেরকেও ফুকাহায়ে কেরাম জনসমাগমে যেতে বারণ করেছেন।

একইভাবে যাদের মুখে দুর্গন্ধ আছে কিংবা যারা দুর্গন্ধযুক্ত যখমে আক্রান্ত, তাদেরকেও ফুকাহায়ে কেরাম একই কারণে জনসমাগমে যেতে নিষেধ করেছেন।

কাযি ইয়ায রহ. (৫৪৪হি.) বলেন,

وكذلك حكم أكل الفجل لمن يتجشى به أو غير ذلك مما تستقبح رائحته ويتأذى به، وقد ذكر أبو عبد الله بن المرابط فى شرحه: أن حكم من به داء البخر فى فيه، أو به جرح به رائحة هذا حكم ... وقاسوا على هذا مجامع الصلاة فى غير المساجد، كمصلى العيدين والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وقد ذكر بعض فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيها هذا الحكم كمجالس العلم والولائم وحلق الذكر. –إكمال المعلم، ج: 2، ص: 496-497، باب: نهى من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، ط. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر

“মূলা খেয়ে যার ঢেকুর আসছে, কিংবা অন্য কোনো বস্তু, যাতে দুর্গন্ধ রয়েছে এবং অন্যরা কষ্ট পায়, সবগুলোর একই বিধান। আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল মুরাবিত রহ. তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যার মুখ থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোর রোগ আছে কিংবা যার শরীরে দুর্গন্ধযুক্ত জখম রয়েছে, তারও একই হুকুম। ... মসজিদের বাইরের সালাতের স্থানগুলোকেও উলামায়ে কেরাম এর উপর কিয়াস করেছেন। যেমন ঈদগাহ, জানাযার স্থান এবং ইবাদাতের অন্যান্য জমায়েত। আমাদের কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন, মুসলমানদের স্বাভাবিক মজলিসগুলোরও একই বিধান। যেমন ইলম ও ওলিমার মজলিস বা যিকিরের হালকা।” –ইকমালুল মু’লিম ২/৪৯৬-৪৯৭

ইবনে বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.) বলেন,

قال ابن حبيب: وكذلك يمنع المجذوم من المسجد والدخول بين الناس واختلاطة بهم كما روى عن عمر أنه مر بامرأة مجذومة تطوف بالبيت فقال لها: ياأمة الله، اقعدى فى بيتك ولاتؤذي الناس. –شرح صحيح البخاري لابن بطال، باب: الجذام، ج: 9، ص: 412، ط. مكتبة الرشد – السعودية، الرياض

“ইবনে হাবিব রহ. বলেন, কুষ্ঠ রোগীকে মসজিদ থেকে এবং জনসাধারণের সাথে মেলামেশা থেকে বারণ করা হবে। যেমন বর্ণিত আছে, উমর রাদি. এক কুষ্ঠ রোগী মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে বাড়ি বাড়ি ফিরে বেড়াচ্ছিল। তখন তিনি মহিলাটিকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দি! আপন ঘরে বসে থাক। লোকজনকে কষ্ট দিয়ো না।” -ইবনে বাত্তাল রহ. কৃত শরহে সহীহ বুখারি ৯/৪১২

বদরুদ্দিন আইনি রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,

قال عياض: قال بعض العلماء ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يتجنب ويحترز منه، وينبغي للإمام منعه من مداخلته الناس ويلزمه بلزوم بيته، وإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه فضرره أكثر من آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد لئلا يؤذي الناس، ومن ضرر

المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه –عمدة القارئ، ج: 21، ص: 267، باب: العين حق، ط. دار إحياء التراث العربي – بيروت

“কাযি ইয়ায রহ. বলেন, কোনো কোনো আলেম মত দিয়েছেন, কোনো লোক নজর লাগে বলে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলে; তার থেকে দূরে এবং সতর্ক থাকতে হবে। ইমামুল মুসলিমিনের উচিৎ হল, তাকে জনসাধারণের সাথে মেশা থেকে বারণ করা এবং ঘরে থাকতে বাধ্য করা। গরীব হলে চলার মতো ভাতার ব্যবস্থা করবেন। তার অনিষ্ট পেঁয়াজ ও রসুনখোরের চেয়েও বেশি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন, যেন লোকজনের কষ্ট না হয় এবং সেই কুষ্ঠ রোগীর অনিষ্টের চেয়েও বেশি, উমর রাদি. যাকে নিষেধ করেছিলেন।” –উমদাতুল কারি ২১/২৬৭

ইবনে বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.) আরো বলেন,

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: من أكل الثوم يوم الجمعة لا أرى له أن يشهد الجمعة فى المسجد ولا رحابه، وبئس ما صنع من أكل الثوم وهو ممن تجب عليه الجمعة. وفيه: دليل أن كل ما يتأذى به كالمجذوم وشبهه يبعد عن المسجد وحلق الذكر، وقد قال سحنون: لا أرى الجمعة تجب على المجذوم، واحتج بقوله عليه السلام: (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا) . –شرح صحيح البخاري لابن بطال، باب: مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيءِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، ج: 2، ص: 466، ط. مكتبة الرشد – السعودية، الرياض

“ইবনে ওয়াহব রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুমআর দিন রসুন খেয়েছে, আমি মনে করি না যে, সে জুমআয় শরীক হতে পারবে; মসজিদেও না, মসজিদের আঙ্গিনায়ও না। তবে জুমআ ফরয হওয়া সত্ত্বেও রসুন খেয়ে সে বড় অন্যায় করেছে’।

বর্ণনাটি একথার দলীল যে, কুষ্ঠ রোগী বা তার মতো অন্য সকল ব্যক্তি, যার দ্বারা কষ্ট হতে পারে: তাদেরকে মসজিদ ও যিকিরের হালকা থেকে দূরে রাখা হবে। সুহনূন রহ. তো বলেছেনই, ‘আমি মনে করি না, কুষ্ঠ রোগীর উপর জুমআ ফরয’। এর স্বপক্ষে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী দিয়ে দলীল দিয়েছেন, ‘যে ব্যক্তি রসুন খায়, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে’।” –ইবনে বাত্তাল রহ. কৃত শরহে সহীহ বুখারি ২/৪৬৬

এটি সমর্থন করে আইনি রহ. (৮৫৫হি.) বলেন,

وصرح بالمجذوم ابن بطال، ونقل عن سحنون، لا أرى الجمعة عليه، واحتج بالحديث. ... وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به –عمدة القارئ، ج: 6، ص: 146، باب: ما جاء في الثوم النيء والبصعل والكراث، ط. دار إحياء التراث العربي – بيروت

“কুষ্ঠ রোগীকে মসজিদ থেকে বারণ করার কথা ইবনে বাত্তাল রহ. পরিষ্কারই বলেছেন এবং সুহনুন রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘আমি মনে করি না যে, তার উপর জুমআ ফরয’। এর স্বপক্ষে তিনি উক্ত হাদীস দিয়ে দলীল দিয়েছেন।” –উমদাতুল কারি ৬/১৪৬

করোনা সংশ্লিষ্ট যাদেরকে নিষেধ করা যাবে

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, করোনা সংশ্লিষ্ট যে ব্যক্তিদের কারণে অন্যের কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, শুধু তাদেরকে মসজিদে, জামাতে ও জুমআয় উপস্থিত হতে বারণ করা যাবে। যেমন:

১. ইতিমধ্যে যাদের করোনা শনাক্ত হয়েছে।

২. যাদের মধ্যে জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদির মতো করোনার উপসর্গগুলো প্রকাশ পেয়েছে। তাদেরও আক্রান্ত হয়ে থাকার সম্ভাবনা আছে বিধায় বারণ করা যায়।

আর তাদের করোনা পরীক্ষা যদি নেগেটিভ হয়, কিন্তু এই উপসর্গগুলো তাদের মধ্যে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট থাকে, তাহলেও সেগুলো থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তাদের জামাআত থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এই সমস্যাগুলোকে এখন সবাই করোনার উপসর্গ হিসেবে জানে। ফলে তার উপস্থিতিতে মসজিদের মুসল্লিদের মধ্যে অস্বস্তি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হতে পারে। যদিও বিষয়টি এই পর্যায়ে আসা কাম্য ছিল না, কিন্তু জাহেল সমাজের জন্য এটি ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। সবার জ্ঞান ও দ্বীনি বুঝ স্বাভাবিক স্তরে থাকলে হয়তো এমন ব্যক্তিকে, পরীক্ষায় নেগেটিভ নিশ্চিত হওয়ার পর, জামাতে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়াই সঙ্গত হত।

৩. যেসব ডাক্তার, সেবক ও সেবিকা; করোনা রোগীর চিকিৎসা দিচ্ছেন।

৪. যারা করোনা রোগীর সেবায় আছেন বা ছিলেন।

৫. যারা করোনা রোগীর সংস্পর্শে ছিলেন।

৬. যারা এমন কোনো এলাকা থেকে এসেছেন, যেখানে করোনা ইতোমধ্যে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে।

কারণ এদের সকলেরই আক্রান্ত হওয়া বা ভাইরাস বহন করা স্বাভাবিক।

উপরের ৩ থেকে ৬; এ চার শ্রেণীর লোক হোম কোয়ারেন্টাইনের মেয়াদ পার করার পরও যখন তাদের মধ্যে করোনার কোনো উপসর্গ দেখা না দেবে, তখন তারা জামাতে অংশগ্রহণ করবেন।

উপরোক্ত ছয় শ্রেণির লোকদের মসজিদ ও জামাআত থেকে বারণ করার বিষয়টি মোটামুটি পরিষ্কার।

এছাড়াও পরিস্থিতির নাযুকতার বিচারে সময়ের বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীর লোককেও আপাতত মসজিদে না আসার পরামর্শ দিয়েছেন।

১. যারা অন্য এমন কোনো রোগে আক্রান্ত রয়েছেন, যার ফলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের জন্য মসজিদে যাওয়া আবশ্যক নয়, কিন্তু তারা আজিমত (অধিক সওয়াবের আশায়, যা তাদের দায়িত্ব নয়, এমন আমল) হিসেবে মসজিদে উপস্থিত হয়ে থাকেন।

২. বেশি বয়স্ক মুরব্বিগণ। বিশেষত যেসব মুরব্বি কোনো রোগে আক্রান্ত রয়েছেন। কারণ, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হওয়ায়, তাদের সহজেই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. নাবালেগ শিশুরা, বিশেষ করে যারা খুব ছোট। তাদের উপর এমনিতেই সালাত ফরয নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা মসজিদে যাবে না; (অভিভাবকরা তাদেরকে ঘরে সালাত আদায় করানোর ব্যবস্থা করবে)।

৪. আতঙ্কের কারণে যাকে তার বাবা-মা অথবা স্ত্রী কিংবা ছেলেসন্তানরা বাইরে বের হতে বাধা দিচ্ছে।

৫. আতঙ্কের কারণে যাকে তার প্রতিবেশী বা একই ভবনের বাসিন্দারা বাধা দিচ্ছে।

৬. যিনি নিজে আক্রান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা বোধ করার দরুন, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার হিম্মত করতে পারছেন না।

আমরা মনে করি, তাঁদের এই পরামর্শের উপর আমল করার সুযোগ আছে। আশা করি উপরোক্ত ১২ শ্রেণির; যারা মসজিদের জামাতে অংশ গ্রহণ করে সালাত আদায়ের তামান্না লালন করা সত্ত্বেও উক্ত ওজরের কারণে মসজিদে না গিয়ে ঘরে সালাত আদায় করবেন, তাদেরকে আল্লাহ মসজিদের জামাআতের সওয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا -صحيح البخاري: 2996

"আবু মূসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তখন সে সুস্থ থাকা অবস্থায় এবং বাড়িতে থাকা অবস্থায় যে আমল করত, তার সমপরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায় লিখা হয়।" -সহীহ বোখারী: ২৯৯৬

যে এলাকায় করোনা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে

অবশ্য যে এলাকায় করোনা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে, এই অবস্থা বিরাজমান থাকা পর্যন্ত, তা তাদের জন্য মসজিদে না যাওয়ার ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে সে ক্ষেত্রে তাদেরকে অন্তত কয়েকজনের জামাআতের মাধ্যমে হলেও মসজিদ আবাদ রাখার ফরজে কেফায়া আদায় করতে হবে।

জামিয়াহ ইসলামিয়াহ বিন্নুরি টাউনের ফতোয়ায় বলা হয়েছে,

اور جس محلہ میں کرونا وائرس کی وبا عام ہوجائے تو اس محلہ کے لوگوں کے لیے مسجد میں نماز نہ پڑھنے کی رخصت تو ہوگی، البتہ اس محلے کے چند لوگوں کو پھر بھی مسجد میں

باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا اور اگر مسجد میں باجماعت نماز پورے محلے والوں نے ترک کردی تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا؛ کیوں کہ مسجد کو اس کے اعمال سے آباد رکھنا فرضِ کفایہ ہے۔[2]

“এবং যে মহল্লায় করোনা ভাইরাসের মহামারি ব্যাপক হয়ে যাবে, সেই মহল্লার লোকদের জন্য মসজিদে নামায না পড়ার রোখসত হবে (অবকাশ থাকবে) ঠিক, কিন্তু মহল্লার কিছু লোককে তথাপিও মসজিদের জামাআতে নামায পড়ার ইহতেমাম করতে হবে। মহল্লার সকলেই যদি মসজিদের জামাআত ছেড়ে দেয়, সকলেই গোনাহগার হবে। কারণ মসজিদকে তার আমল দ্বারা আবাদ রাখা ফরজে কেফায়া।” অন্যদেরকে মসজিদ, জুমআ ও জামাআত থেকে বাধা দেয়া যাবে না। উক্ত ১২ শ্রেণি ছাড়া সুস্থ লোকজনের উপর জামাআত ও জুমআর বিধান আগে যা ছিল, এখনো তাই আছে। সুতরাং তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মসজিদে আসবেন এবং মসজিদ আবাদ রাখবেন। তাদের জন্য জামাআত ও জুমআ ত্যাগ করার সুযোগ নেই। ব্যাপকভাবে মসজিদ বন্ধ রাখার তো প্রশ্নই আসে না। মসজিদ অবশ্যই তাদের জন্য খোলা রাখতে হবে। সরকার বা কমিটি কারো জন্যই মাসজিদ বন্ধ রাখা বা তাদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করার অধিকার নেই। বরং এই বিপদ ও রমজানের মুবারক মুহূর্তে তাদেরকে আরো অধিক পরিমাণে মুসজিদমুখী করাই সকলের দায়িত্ব, যা আল্লাহর গজব থেকে মুক্তির জন্য মুসলমানদের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম দায়িত্ব। তা না করে তাদের বাধা প্রদান করা; আসবাব ও উপায় উপকরণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও জাহেলিয়াত এবং আকিদার বিচ্যুতির অন্তর্ভুক্ত। এটা বুঝায়, আমরাও

সংক্রামক রোগকে জাহেলি যুগের মতো সংক্রমণে সক্ষম মনে করি, যার ফলে তা থেকে বাঁচার জন্য শরীয়তের অনুমোদনের বাইরে পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে জরুরি মনে করি। যা মুক্তির পরিবর্তে আল্লাহর ক্রোধ ও গজবকে আরো তরান্বিত করার আশঙ্কা তৈরি করবে।

শরীয়ত এমন সংক্রামক রোগের মহামারির অজুহাতে; জামাআত ও জুমআ বর্জন করা এবং মসজিদ বন্ধ করার অনুমোদন দেয় না।

প্রথম কারণ

জুমআ ও জামাআত দ্বীনের শেয়ার ও প্রতীক

জুমআ 'নসসে কতয়ি' তথা সরীহ ও সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত ফরয এবং ইসলামের শিয়ার ও নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) الجمعة

"হে মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন সালাতের আযান হয়, তোমরা আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা জান। অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে

যমিনে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" –সূরা জুমআ (৬২): ৯-১০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض –سنن ابي داود، رقم: 1067؛ ط. دار الرسالة العالمية، ت: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي، قال الشيخ الأرنؤوط رحمه الله تعالى: إسناده صحيح. اهـ

"জামাআতের সাথে জুমআ আদায় করা প্রতিটি মুসলিমের ওয়াজিব কর্তব্য। তবে চার শ্রেণী ছাড়া; গোলাম, মহিলা, শিশু ও অসুস্থ।" –সুনানে আবু দাউদ ১০৬৭

জুমআ ছাড়লে হাদীসে কঠিন ধমকি ও মন্দ পরিণতির কথা এসেছে। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين –صحيح مسلم، رقم: 2039؛ ط. دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـــ بيروت

“কিছু লোক (যারা জুমআয় আসে না) হয় জুমআ ছাড়া বন্ধ করবে, নয়তো আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন। ফলে তারা গাফেলদের দলভুক্ত হয়ে পড়বে।” –সহীহ মুসলিম ২০৩৯

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন,

من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، طبع الله على قلبه –سنن ابي داود، رقم: 1052؛ ط. دار الرسالة العالمية، ت: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي، قال الشيخ الأرنؤوط رحمه الله تعالى: صحيح لغيره. اهـــ

“অলসতা করে যে ব্যক্তি তিনটি জুমআ ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেবেন।” –সুনানে আবু দাউদ ১০৫২

পাঁচ ওয়াক্তের জামাআতের গুরুত্বও আমাদের জানা আছে। জামাআতের ব্যাপারে অসংখ্য হাদীসে অনেক কঠিন তাকিদ এসেছে। যার ফলে কোনো কোনো ইমাম; ব্যক্তির উপরও জামাআত ফরয বলেছেন, কোনো কোনো ইমাম ওয়াজিব বলেছেন। আর সমষ্টিগতভাবে যে জামাআত প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরজ, এ বিষয়ে কারোই দ্বিমত নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বলেছেন, আমার মন চায়, যারা জামাতে আসে না, তাদের ঘরশুদ্ধ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই। কখনো বলেছেন, আযান শুনেও যে মসজিদের আসল না, তার সালাতই হবে না। ইরশাদ হচ্ছে,

والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم –

صحيح البخاري، باب: وجوب صلاة الجماعة، رقم: 618؛ ط. دار ابن كثير، اليمامة – بيروت؛ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا

“ঐ জাতের কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমার ইচ্ছা হয়েছিল যেন লাকড়ি জমা করতে আদেশ দেই। জমা হয়ে গেলে সালাতের আদেশ দেই। আযান হয়ে গেলে একজনকে বলি ইমামতি করুক। এরপর আমি কিছু লোকের বাড়ি গিয়ে তাদের ভিতরে রেখেই ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিই।” – সহীহ বুখারি ৬১৮

من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر –سنن ابي داود، رقم: 793؛ ط. دار الرسالة العالمية، ت: شعَيب الأرنؤوط – مَحَمَّد كامِل قره بللي، قال الشيخ الأرنؤوط رحمه الله تعالى: رجاله ثقات. اهـــ

“আযান শুনার পরও যে বিনা উজরে সালাতে আসবে না, তার সালাত হবে না।” –সুনানে আবু দাউদ: ৭৯৩

এরকম আরো অনেক হাদীস আছে, যেগুলো অনেকেরই জানা। আমরা এখানে তা উল্লেখ করে আলোচনা দীর্ঘ করতে চাই না। আরো দেখুন সহীহ বোখারী: ২২৮৮; সহীহ মুসলিম: ১৫১৪, ১৫১৯, ১৫২০; সুনানে আবু দাউদ: ৭৯২;

জুমআ ও জামাআত অন্যান্য ফরজ বিধানের মতো নয়, এগুলো দ্বীনের শেয়ার ও প্রতীক, যার গুরুত্ব অন্যান্য সাধারণ ফরজের চেয়ে অনেক বেশি। ইবনে আবিদিন শামি রহ. (১২৫২ হি.) বলেন,

الشعائر: العلامات كما في القاموس ح. قال في معراج الدراية: وشرعا ما يؤدى من العبادات على سبيل الاشتهار كالأذان والجماعة والجمعة وصلاة العيد والأضحية. وقيل هي ما جعل علما على طاعة الله تعالى. اهـــ. –رد المحتار، ج: 1، ص: 21–22، ط. دار الفكر–بيروت

“শিয়ার অর্থ আলামত (পরিচয়বাহী নিদর্শন); যেমনটা কামূসে বলা হয়েছে। মি’রাজুদ দিরায়াতে বলা হয়েছে, শরীয়তের পরিভাষায় শিয়ার বলে এমনসব ইবাদাতকে, যেগুলো প্রকাশ্যে প্রসিদ্ধির সাথে আদায় করা হয়। যেমন আযান, জামাআত, জুমআ, ঈদের সালাত ও কুরবানি। কেউ কেউ বলেন, শেয়ার হচ্ছে ইসলামের সেসব বিষয়, যেগুলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত।” –রদ্দুল মুহতার ১/২১-২২

অর্থাৎ এসব বিষয় আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের নিদর্শন এবং দ্বীনে ইসলামের পরিচায়ক। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল দ্বীনদার মুসলমান জানে যে, এগুলো ইসলামের বিধান। সর্বসম্মুখে প্রসিদ্ধির সাথে এগুলো পালন করা জরুরি।

দ্বিতীয় কারণ:

মসজিদ আবাদ ঈমানের নিদর্শন, কাফির তার অধিকার রাখে না

মসজিদ আল্লাহর ঘর। মসজিদ বানানো হয়েছে ইবাদতের জন্য। মসজিদে জুমআ-জামাআত আদায়ও ইসলামের শেয়ার। মসজিদ নির্মাণ করা এবং সালাত, যিকির, তা'লিম ও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে মসজিদ আবাদ রাখা ঈমানদারদের ফরজ দায়িত্ব। মসজিদ আবাদ করা ঈমানের আলামাত। পক্ষান্তরে মসজিদ বন্ধ করে দেয়া বা মসজিদ আবাদে বিধি নিষেধ আরোপ করা ঈমান পরিপন্থী কাফের ও মুশরিকসুলভ কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)

التوبة

"মুশরিকরা এ কাজের উপযুক্ত নয় যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরের সাক্ষী। ঐসব লোকের সমস্ত কর্ম বাতিল হয়ে গেছে এবং জাহান্নামেই তাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে।

আল্লাহর মসজিদ তো আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। এরূপ লোকদের ব্যাপারেই আশা করা যায়, তারা

সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” –সূরা তাওবা (৯): ১৭-১৮

ইমাম রাযি রহ. (৬০৬ হি.) বলেন,

فجعل عمارة المسجد دليلا على الإيمان –مفاتيح الغيب، ج: 4، ص: 13، ط. دار إحياء التراث العربي – بيروت

“মসজিদ আবাদ করাকে আল্লাহ তাআলা ঈমানের পরিচায়ক সাব্যস্ত করেছেন।” –তাফসিরে কাবির ৪/১৩

আবুস সাউদ রহ. (৯৮২ হি.) বলেন,

والمرادُ بالعمارة ما يعم مَرَمَّةَ ما استرمّ منها وقمُّها وتنظيفُها وتزيينُها بالفُرُش وتنويرُها بالسُّرُج وإدامةُ العبادة والذكرُ ودراسةُ العلوم فيها ونحوُ ذلك وصيانتُها مما لم تُبنَ له كحديث الدنيا –إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج: 4، ص: 51، ط. دار إحياء التراث العربي – بيروت

“দরকার পড়লে মেরামত করা, ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার পরিপাটি করে রাখা, কার্পেট বিছিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা, বাতি ও আলোর ব্যবস্থা রাখা, নিয়মতান্ত্রিক ইবাদত ও আল্লাহর যিকির জারি রাখা, ইলমে দ্বীনের দরস দেয়া ইত্যাদির পাশাপাশি যেসব কাজের জন্য মসজিদ বানানো হয়নি, সেগুলো থেকে মসজিদ সুরক্ষিত রাখা, যেমন দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা, এ

সব কিছুই মসজিদ আবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য।” –তাফসিরে আবুস সাউদ ৪/৫১

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْأَنْفَالِ:34

“আল্লাহ কেন তাদেরকে আযাব দিবেন না, অথচ তারা মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করে। তারা তো তার অভিভাবক নয়। তার অভিভাবক তো একমাত্র মুত্তাকিরাই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।” –সূরা আনফাল (৮): ৩৪

তৃতীয় কারণ:

মসজিদ আবাদে বাধা দেয়া শিরক স্তরের গোনাহ

মসজিদ বন্ধ করে দেয়া, মসজিদ আবাদে বিধি নিষেধ আরোপ করা এবং বাধা দেয়া, আল্লাহর এ মাকসাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ ধরনের লোককে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় জালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমরা জানি, কোরআনের ভাষায় শিরক হল, সবচেয় বড় জুলুম এবং মুশরিক হল সবচেয়ে বড় জালিম। যারা আল্লাহর প্রতি অপবাদ ও মিথ্যারোপের শিরক করে, তাদের জন্য যে বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক একই

বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, মসজিদের বাধা প্রদানকারীর জন্যও। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) البقرة

“ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর স্মরণে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে বিরাণ করতে চেষ্টা করে? এ ধরনের লোকদের মূলত আল্লাহর ঘরে ঢোকার অধিকার নেই। (কোনো বিশেষ কারণে ঢুকতে হলে) তারা ভীত সন্ত্রস্ত্র অবস্থায় ঢুকবে। এদের জন্য দুনিয়াতে যেমন রয়েছে লাঞ্ছনা, আখেরাতেও রয়েছে মহা শাস্তি।” –সূরা বাকারা (২): ১১৪

ইমাম ইবনে কাসির রহ. (৭৭৪ হি.) বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ قُرَيْشًا مَنَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ}. –تفسير ابن كثير، ج:1، ص: 388

“ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, কুরাইশরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে হারামে কা’বার সামনে সালাত আদায়ে বাধা দিল, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, ‘ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম

আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর স্মরণে বাধা দেয়’।” - তাফসীরে ইবনে কাসির: ১/৩৮৮

চতুর্থ কারণ:

শিয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য কিতাল ওয়াজিব

ইসলামে শিয়ার ও নিদর্শন পর্যায়ের ইবাদতগুলোর গুরুত্ব এত বেশি যে, কোনো এলাকার লোকজন যদি সেগুলোর কোনো একটি ছেড়ে দেয়, তাহলে যুদ্ধ করে হলেও তা পালন করতে বাধ্য করা হয়। এমনকি তা যদি সুন্নত হয় তবুও। শেয়ার পর্যায়ের সুন্নত সাধারণ সুন্নতের মতো নয়।

আলাউদ্দীন সমরকন্দি রহ. (৫৪০ হি.) বলেন,

عن محمد أن أهل بلدة من بلاد الإسلام إذا تركوا الأذان والإقامة فإنه يجب القتال معهم –تحفة الفقهاء، ج: 1، ص: 109، ط. دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

“মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত, দারুল ইসলামে কোনো এলাকার লোকজন আযান ইকামত ছেড়ে দিলে, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব।” – তুহফাতুল ফুকাহা: ১/১০৯

আকমালুদ্দীন বাবারতি রহ. (৭৮৬ হি.) বলেন,

قال ذلك؛ لأنه وإن كان سنة إلا أن تركه بالإصرار استخفاف بالدين فلزم القتال –العناية، ج: 1، ص: 240، ط. دار الفكر

“মুহাম্মাদ রহ. কিতালের কথা বলেছেন কারণ, আযান সুন্নত হলেও নিয়মতান্ত্রিক তা ছেড়ে দেয়া দ্বীনি বিষয়কে অবজ্ঞা করা বা হালকা মনে করার শামিল। তাই কিতাল আবশ্যক।” –আলইনায়া: ১/২৪০

যাইলায়ি রহ. (৭৪৩ হি.) বলেন,

إذا كانت السُّنة من شعائر الدين يقاتل عليها – تبيين الحقائق، ج: 1، ص: 90، ط. المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة

“সুন্নত যদি শাআয়েরে দ্বীনের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে সেটি ছেড়ে দিলে যুদ্ধ করা হবে।” -তাবয়িনুল হাকায়িক: ১/৯০

সিরাজুদ্দীন ইবনে নুজাইম রহ. (১০০৫ হি.) বলেন,

والقتال عليه لما أنه من أعلام الدين وفي تركه استخفاف ظاهر به –النهر الفائق، ج: 1، ص: 171، ط. دار الكتب العلمية

“আযান ছেড়ে দিলে কিতাল করতে হবে এ কারণে যে, তা দ্বীনের শেয়ার। আর তা ছেড়ে দেয়া মানে দ্বীনের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা।” –আননাহরুল ফায়িক: ১/১৭১

মোল্লা আলি কারি রহ. (১০১৪ হি.) বলেন,

السُّنة إذا كانت من الشعائر يقاتل عليها –شرح الوقاية لعلي القارئ، ج: 1، ص: 213، ط.

“সুন্নত যদি শাআয়েরে দ্বীনের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে সেটি ছেড়ে দিলে যুদ্ধ করা হবে।” –মোল্লা আলি কারি রহ. প্রণীত বেকায়া কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘শরহে বেকায়া’ ১/২১৩

তিনি আরো বলেন,

(والجَمَاعَةُ) في الصلاة الفريضة ... لا يُرَخَّصُ لأحد تركها إلاَّ لعذر، حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها. فإن ائتمروا وإلا تحلّ مقاتلتهم، لأنها من شعائر الإسلام، وخصائص هذا الدين، فالسبيل إظهارها والزَّجْرُ عن تركها. –شرح الوقاية لعلى القارئ، ج: 1، ص: 321

“বিনা ওজরে ফরজ সালাতের জামাআত ত্যাগ করার সুযোগ নেই। এমনকি কোনা এলাকার লোকজন যদি জামাআত ছেড়ে দেয়, তাহলে প্রথমে তাদেরকে জামাআত করতে আদেশ দেয়া হবে। যদি মানে ভাল, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে কিতাল বৈধ হয়ে যাবে। কেননা, জামাআত দ্বীনের শেয়ার এবং ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এটি সর্বসম্মুখে প্রকাশ্যে আদায় করতে হবে এবং ত্যাগ করলে তা থেকে ফেরাতে হবে।” –মোল্লা আলি কারি রহ. প্রণীত বেকায়া কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘শরহে বেকায়া’ ১/৩২১

পঞ্চম কারণ:

দীর্ঘ দেড় হাজার বছরেও মসজিদ বন্ধের ইতিহাস নেই

এসব কারণেই ইসলামের দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে, অনেক সংক্রামক রোগ ও মহামারির, কঠিন যুদ্ধ বিগ্রহ এবং ব্যাপক হারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও, কোনো কারণেই কখনো জামাআত, জুমআ ও মসজিদ বন্ধের ইতিহাস নেই।

শায়খ ড. আব্দুল্লাহ আব্দুল বাসিত রিফায়ি বলেন,

ومرَّ قبلَ وقتِنا هذا على المسلمينَ حروبٌ وملاحمُ هلكَ فيها ألوفُ الألوفِ وظهرتْ بينهم أمراضٌ مِن أوبئةٍ وغيرِها انتشرَتْ وشاعَتْ من أيامِ رسولِ اللهِ عليه الصلاةُ والسلامُ ثم خلافةِ عمرَ رضيَ اللهُ عنه إلى أيامنا هذه منها الحُمَّى والطاعونُ والمالاريا والجُدَرِيُّ والحُصبةُ والكُوليرا وغيرُ ذلك فلم يَدْعُ عالِمٌ منهم إلى إغلاقِ مسجدٍ مِن مساجدهم ولا دعَا حاكمٌ مهما اشتدَّ ظُلمُهُ إلى منعِ صلواتِ الجمعِ والجماعاتِ فِي بلادهم ولا تجنَّبُوا إقامةَ صلواتِ الجنازةِ جماعةً على مَن ماتَ منهم بالأمراضِ[3]

“অতীতেও মুসলিমদের উপর দিয়ে অসংখ্য কঠিন যুদ্ধ বিগ্রহ অতিবাহিত হয়েছে, যেগুলোতে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যু বরণ করেছে। মহামারিসহ বিভিন্ন রোগ ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা থেকে শুরু করে উমর রাদি.-এর খেলাফত হয়ে; আজ পর্যন্ত জ্বর, তাউন, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, হাম ও কলেরাসহ নানা

রকমের রোগ ব্যাধি দেখা দিয়েছে। কিন্তু একজন আলেমও কোনো একটি মসজিদ বন্ধ করার কথা বলেননি। ভয়ানক প্রকৃতির কোনো জালেম শাসক পর্যন্ত; জুমআ জামাআত বন্ধের কথা বলেনি। রোগে পড়ে যারা মারা গেছে, জামাআতের সাথে তাদের জানাযা পড়া থেকেও দূরে থাকেননি।" – sawtululama.info আরবি সাইট থেকে সংগৃহীত

জামিয়া আযহারের ইসলামী ইতিহাসের অধ্যাপক ড. আইমান ফুআদ বলেন,

إنه لا يوجد واقعة محددة ذكرت منع صلاة الجمعة عبر التاريخ[4]

"জুমআ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এমন কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না।" – youm৭ আরবি পত্রিকা থেকে সংগৃহীত

লিবিয়ার মুফতি সাদিক আলগিরয়ানি বলেন,

أنه "لم يثبت في تاريخ المسلمين، أن عطلت المساجد في البلد كلها بصفة عامة، ومنع الناس من الصلاة فيها؛ لا في أوقات الأوبئة ولا الحروب، التي عم فيها الخوف الناس جميعًا[5]".

"ব্যাপকভাবে সবখানে মসজিদ বন্ধ করে দেয়া এবং জনসাধারণকে সালাত থেকে বাধা দেয়ার নজির ইসলামের ইতিহাসে নেই। মহামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, যেগুলোতে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মাঝে ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলোর কোনোটিতেই এর নজির নেই।" – আরবি alsaaa২৪.com থেকে সংগৃহীত

বরং শায়খ ড. আব্দুল্লাহ আব্দুল বাসিত রিফায়ি বলেন,

وقد سُئِلَ كبارُ علماءِ مصرَ سنةَ ستة عشر وثلاثمائة بعد الألف (١٣١٦هـ)
عن حُكمِ منعِ الحجِّ مِن مصرَ لوجودِ وباءٍ فِي الحجازِ وحصلَ ذلك عندما
كان العلماءُ فيها حقَّ العلماءِ فأفتَوْا بالإجماع بعدمِ جواز المنع مِن فريضة
الحجِّ كما جاء فِي العدد الثلاثين مِنَ المجلد الثانى فِي مجلة المنار ما يلِي (اجتمع
مجلسُ النُّظار – وهو كمجلس الوزراء فِي أيامِنا – اجتماعًا خصوصيًّا
للمذاكرة فِي أمر منعِ الحجِّ الذِى يراه مجلسُ الصحة البحرية ضروريًّا لمنعِ
انتقالِ الوباءِ مِن بلاد الحجاز إلى مصرَ ولَمَّا كان المنعُ مِنَ الحجِّ منعًا مِن ركنٍ
دينِيٍّ أساسٍ لم يكن للنُّظار أن يُبرموا فيه أمرًا إلا بعد الاستفتاءِ مِنَ العلماءِ
... ولهذا طلب رئيسُ مجلسِ النُّظار لحضورِ الاجتماعِ صاحبَ السماحةِ
قاضىَ مصرَ وأصحابَ الفضيلةِ شيخَ الأزهرِ ومفتِىَ الديارِ المصريةِ والشيخَ
عبدَ الرحمن النواوىَّ مفتِىَ الحقانية والشيخَ عبدَ القادر الرافعىَّ رئيس المجلس
العلمىِّ سابقًا فحضرُوا وتذاكرُوا مع النُّظار وبعد أنِ انفضُّوا مِنَ المجلسِ
اجتمعُوا وأجمعُوا على كتابةِ هذه الفتوى وإرسالِهَا إلى مجلس النُّظار وهِىَ
بحروفها بعد الافتتاحِ [لم يذكرْ أحدٌ منَ الأئمة مِن شرائطِ وجوبِ أداء الحجِّ
عدمَ وجودِ المرض العام فِي البلاد الحجازية فوجود شىْءٍ منه فيها لا يمنعُ
وجوبَ أدائه على المستطيع وعلى ذلك لا يجوزُ المنعُ لِمَنْ أراد الخروج للحجِّ

مع وجود هذا المرض متى كان مستطيعًا. وأما النَّهْيُ عنِ الإقدامِ على الأرض المَوْبُوءةِ الواردُ فِي الحديث فمحمولٌ على ما إذا لم يعارضه أقوَى كأداءِ الفريضة كما يُستفاد ذلك مِن كلام علمائنا. وأيضًا فإنَّ النَّهْيَ عن الدخول والخروج تابعٌ لاعتقادِ الشخصِ الذِى يريدُ الدخولَ أوِ الخروجَ كما يُفيدُهُ ما فِى تنوير الأبصار متنِ الدُّرِّ المختار حيث قال وإذا خرج من بلدة بها الطاعون وهو الوباءُ العامُّ فإن عَلِمَ – أىْ اعتقدَ بثباتٍ وقوةِ يقينٍ – أنَّ كلَّ شىْءٍ بقدرِ الله تعالى فلا بأسَ بأن يخرج ويدخل وإنْ كان عنده أنه لو خرجَ نجا ولو دخلَ ابتُلىَ به كُرِهَ له ذلك فلا يدخلُ ولا يخرجُ. وأيَّدَهُ شارحُهُ السِّندىُّ والله أعلم. فِى ٢ ذى القعدة سنة ١٣١٦[].

“১৩১৬ হিজরিতে মিশরের বড় বড় আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হেজায ভূমিতে মহামারি চলছে বিধায়, মিশরের জনসাধারণকে হজ্ব করতে নিষেধ করা যাবে কি না? এ প্রশ্নটি করা হয়েছিল যখন মিশরের আলেমরা সত্যিকারের আলেম ছিলেন। তাঁরা সকলে তখন ঐক্যবদ্ধ ফতোয়া দিয়েছিলেন, হজ্বের ফরয আদায়ে বাধা দেয়া জায়েয হবে না। যেমন ‘আলমানার’ সাময়িকির দ্বিতীয় খণ্ডের ত্রিশতম সংখ্যায় এসেছে,

‘হেজায ভূমি থেকে মিশরে মহামারি স্থানান্তর রুখতে সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিভাগ হজ্ব নিষেধ জরুরী মনে করছে। এমর্মে মন্ত্রী পরিষদ একটি জরুরি পরামর্শ সভায় বসেছে। কারণ হজ্ব নিষেধ মানে দ্বীনের একটি মৌলিক রুকন নিষিদ্ধ করা। তাই আলেমদের কাছে ইস্তিফতা করা ব্যতীত তারা এ বিষয়ে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। পরিষদের প্রধান, নিম্নোক্ত আলেমদের মজলিসে যোগদানের আবেদন জানিয়েছেন। প্রধান

কাযি; মিশর, শাইখুল আযহার, প্রধান মুফতি; মিশর, হক্কানিয়ার মুফতি শায়খ আব্দুর রহমান নববি ও মজলিসে ইলমির প্রাক্তন প্রধান শায়খ আব্দুল কাদের রাফিয়ি।

তাঁরা সকলে উপস্থিত হন। মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে আলোচনা পর্যালোচনা করেন। তাদের সঙ্গে মজলিস শেষ করে উক্ত আলেমরা আবার মজলিসে মিলিত হয়ে সকলে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেন, নিম্নোক্ত ফতোয়া লিখে মন্ত্রী পরিষদের কাছে পাঠানো হবে। হামদ ও সালাতের পরের অংশ থেকে ফতোয়াটি হুবহু তুলে ধরছি:

হজ্ব আদায় ফরয হওয়ার জন্য হেজায ভূমিতে মহামারি না থাকতে হবে, এমন কোনো শর্ত কোনো একজন ইমামও জুড়েননি। কাজেই মহামারি সত্ত্বেও সামর্থ্যবানদের যারা হজ্বে যেতে ইচ্ছুক, তাদেরকে নিষেধ করা জায়েয হবে না।

আর মহামারির ভূমিতে গমনের যে নিষেধাজ্ঞা হাদিসে এসেছে, আমাদের উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, সেটির প্রয়োগ ক্ষেত্র হল, যখন এ নিষেধের বিপরীতে তার চেয়েও শক্তিশালী কোনো নির্দেশ, যেমন ফরয বিধান আদায়ের মতো কোনো বিষয় না থাকবে। অধিকন্তু যাওয়া আসার নিষেধাজ্ঞা ব্যক্তির আকিদার সাথে সম্পৃক্ত; যেমনটা আদদুররুল মুখতারের মতন তানভিরুল আবসার থেকে বুঝা যায়। সেখানে বলা হয়েছে,

‘তাউন তথা প্লেগ মহামারির এলাকা থেকে কেউ বের হতে চাচ্ছে; যদি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, সব কিছু আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির অনুযায়ীই হয়, তাহলে যাওয়া আসাতে কোনো সমস্যা নেই। আর বিশ্বাস যদি এমন

হয় যে, বের হলেই বেঁচে যাবে বা ঢুকলেই আক্রান্ত হবে, তাহলে তার জন্য যাওয়া আসা মাকরূহ। এমন ব্যক্তি যাবেও না আসবেও না'। ভাষ্যকার সিন্দি রহ.ও এটি সমর্থন করেছেন। والله أعلم ২রা জিলকদ, ১৩১৬হি." –প্রাগুক্ত sawtululama.info আরবি সাইট থেকে সংগৃহীত

বর্তমান উলামায়ে কেরামের ফতোয়া

একই কারণে বর্তমান আরব আজমের যেসবহ উলামায়ে কেরাম এবিষয়ে তাগূত শাসকের প্রভাব উপেক্ষা করে কথা বলার চেষ্টা করেছেন, তাঁরাও একই ফতোয়া প্রদান করেছেন।

দারুল উলূম করাচির ফতোয়া

২০ শা'বান ১৪৪১ হি. মোতাবেক ১৪ এপ্রিল ২০২০ ঈ. দারুল উলুম করাচিতে উলামায়ে কেরামের এক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। আল্লামা তাকি উসমানিসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরামের পরামর্শের ভিত্তিতে সেখানে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যাতে পাকিস্তানের প্রায় সকল চিন্তাকেন্দ্রের ১২জন শীর্ষ আলেম প্রতিনিধি স্বাক্ষর করেন। সংক্ষেপে তার সংশ্লিষ্ট অংশ তুলে ধরছি।

احتیاطی تدابیر میں میل جول کم کرنا، بلاضرورت اجتماع سے منع کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس کی سب کو پابندی کرنی چاہئے مگر لازمی سروسز میں کام کو معطل نہیں کیا جاسکتا

اسی لئے ضروری کام کو جاری رکھنے کا اہتمام کیا جارہا ہے۔ ..... اسی طرح ایک مسلمان کیلئے مسجدوں میں نماز یا جماعت اور جمعہ کا اجتماع ایک اہم ضرورت ہے، خاص طور پر رمضان میں مسجد کی حاضری اور نماز باجماعت نہ صرف ایک ضرورت ہے، بلکہ اس آزمائش کے موقع پر خاص طور سے رجوع اِلی اللہ ہی وبا کو دور کرنے کا ایک اہم سبب ہو سکتا ہے، اس کو حتی الامکان احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ .... احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھلی رہیں، اُن میں پنج وقتہ نماز باجماعت، نمازِ جمعہ جاری رہے، تین یا پانچ افراد کی پابندی قابلِ عمل ثابت نہیں ہورہی

-[6]

"সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে, মেলামেশা কম করা, অপ্রয়োজনে জমায়েত থেকে বিরত রাখা খুবই গুরুত্ব বহন করে। সকলেরই তা মান্য করা চাই। তবে প্রয়োজনীয় সার্ভিসগুলোর কাজ বন্ধ করা যাবে না। এজন্য জরুরি কাজ চালু রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

..... এমনিভাবে একজন মুসলিমের জন্য মসজিদের নামায, জামাআত এবং জুমআয় অংশ গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়। বিশেষ করে

রমজান মাসে মসজিদের উপস্থিতি এবং জামাআতের সঙ্গে নামায আদায় করা শুধু জরুরিই নয়; বরং এই কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তে বিশেষভাবে আল্লাহমুখিতাই মহামারি থেকে মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে। এটা যতক্ষণ সম্ভব সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসহ চালু রাখা জরুরি।...

সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসহ মসজিদগুলো খোলা থাকবে, তাতে জামাআতের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামায চালু থাকবে, জুমআ চালু থাকবে। তিনজন, পাঁচজনের বিধিনিষেধ আমলযোগ্য প্রমাণিত হয় না।"

জামিয়া ইসলামিয়া, বিন্নুরি টাউনের ফতোয়া

اگر کسی شہر میں کروناوائرس پھیل جائے (العیاذ باللہ) تو جو لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں، وہ تو شرعاً مریض کے حکم میں ہیں، البتہ جو کروناوائرس میں یقینی طور پر مبتلا نہ ہوں اور نہ ہی ان کے گھر میں یا محلے میں اس قدر وبا پھیلی ہو جس سے ان کو بھی وبا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جانے کا خوف ہو جائے، تو ایسے لوگ مریض نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے لیے مریضوں والی بیان کردہ رخصتیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ صحت مند لوگ ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس شہر میں کروناوائرس پھیلا ہی نہ ہو تو ایسے شہر کو لوگ بھی صحت مند ہیں، مریض نہیں ہیں۔ .... تاہم جس محلہ

میں کرونا وائرس کی وبا عام نہ ہو تو کرونا وائرس کے ڈر سے جماعت کی نماز ترک کر دینا شرعی عذر نہیں ہے، بلکہ توہم پرستی ہے جو کہ ممنوع ہے۔..... مذکورہ بالا تفصیلات سے معلوم ہوا کہ اصحابِ اقتدار کا مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے پر پابندی لگانا جائز نہیں ہے ..... بغیر شرعی عذر کے مساجد کو بند کر دینے پر نصوص میں سخت وعید وارد ہوئی ہے اور ان کے اس عمل کو "ظلم" قرار دیا گیا ہے..... اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ باجماعت نمازیں پڑھنا اور بالخصوص جمعہ کی نماز پڑھنا، یہ شعائرِ اسلام میں سے ہے

-[৭]

"কোনো শহরে যদি (নাউযুবিল্লাহ) ব্যাপক হারে করোনা ভাইরাস বিস্তার লাভ করে, তাহলে যারা তাতে আক্রান্ত হবে, তারা শরীয়তের দৃষ্টিতে অসুস্থ হিসেবে গণ্য হবে। তাছাড়া যাদের আক্রান্ত হওয়া নিশ্চিত না হবে এবং যাদের ঘরে বা এলাকায় করোনা এই পরিমাণ বিস্তার লাভ না করবে, যাতে তাদেরও আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার ভয় হয়, তাহলে তারা অসুস্থ নন এবং তারা রোগীর জন্য দেয়া রুখসত ও সুযোগ সুবিধা পাবেন না। বরং তারা সুস্থ বিবেচিত হবেন। এই বিশ্লেষণ থেকে জানা গেল, যেই শহরে করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঘটেইনি, সেখানকার লোকেরাও শরীয়তের দৃষ্টিতে সুস্থ; অসুস্থ নন।....

....যে শহরে করোনা ভাইরাস বিস্তার লাভ করেনি, সেখানে করোনার ভয়ে জামাআত ত্যাগ করা শরয়ী ওজরের আওতায় পড়বে না। বরং তা সম্পূর্ণই সংশয় ও প্রবৃত্তি পূজা, যা শরীয়তের নিষিদ্ধ।....

....উপরের বিশ্লেষণ থেকে জানা গেল, ক্ষমতাসীনদের জন্য, মসজিদে জামাআতের সঙ্গে নামায আদায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা জায়েয নয়।.... শরয়ী ওজর ব্যতীত মসজিদ বন্ধ করার উপর নুসূসে কঠিন ধমকি আরোপ করা হয়েছে এবং এই কাজটিকে জুলুম সাব্যস্ত করা হয়েছে।.... খুব সম্ভব তার কারণ হল, জামাআতের সঙ্গে নামায আদায় করা, বিশেষ করে জুমআর নামায পড়া ইসলামী শিয়ারের অন্তর্ভুক্ত।"

দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়ায়ও জুমআ আদায়ের সর্বাত্মক চেষ্টা করার কি উপায় হতে পারে, তার বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।[৮]

একই কারণে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামও প্রায় সবাই, বেশ কিছুদিন থেকে মসজিদ খুলে দেয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়ে আসছেন।

একটি ভুল ধারণা

কেউ কেউ মনে করছেন, 'মসজিদ আবাদ করা যেহেতু ফরযে কেফায়া, সুতরাং পাঁচজন মুসল্লি দিয়ে সে ফরয আদায় হয়ে যায়। তাই বাকিদের নিষেধ করাতে কোনো সমস্যা নেই'।

এ ধারণা গলদ। মসজিদ আবাদ রাখা স্বতন্ত্র একটি ফরজে কেফায়া হলেও, জুমআ জামাআত ব্যক্তির জন্য কিফায়া নয়, বরং প্রত্যেকের দায়িত্ব।

গ্রহণযোগ্য শরয়ী ওজর ছাড়া কারো জন্যই জুমআ ও জামাআত ত্যাগ করার সুযোগ নেই। পাঁচজন আদায় করলে, তাদের দায়িত্ব আদায় হবে, কিন্তু তাতে বাকিদের জামাআত ও জুমআর দায়িত্ব আদায় হবে না।

দ্বিতীয়ত মসজিদে আসতে কাউকে বাধা দেয়া হারাম। শরীয়ত যাকে বাধা দেয়ার অনুমতি দিয়েছে, কেবল তাকেই বাধা দেয়া যাবে, অন্য কাউকে নয়। অতএব, গ্রহণযোগ্য ওজর ছাড়া কেউ জুমআ জামাআত ছাড়তেও পারবে না, কাউকে বাধাও দেয়া যাবে না।

সার কথা হল, বর্তমানে যেভাবে মানুষের জন্য ব্যাপকভাবে জুমআহ, জামাআত ও মজিদের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, শরীয়তে তার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামের দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে এমন পরিস্থিতি সামনে আসা সত্ত্বেও এভাবে মসজিদ, জামাআত ও জুমআয় বিধি নিষেধ আরোপের কোনো নজির নেই। এভাবে মসজিদের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা শিরকি গোনাহ। যারা এমন বিধি নিষেধ আরোপ করে, কোরআনে বলা হয়েছে, তাদের চেয়ে বড় জালিম হতে পারে না।

একটি হাদীসের ব্যাখ্যা

একটি হাদীসে এসেছে,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ « أَلاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ ». -صحيح مسلم: 1632

“ইবনে উমর রাদি. কনকনে শীত ও ঝড়ের এক রাতে আযান দেন। আযানের পর ঘোষণা দেন, ‘তোমরা নিজ নিজ ঘরে সালাত আদায় করে নাও’। তারপর বলেন, বৃষ্টিময় শীতের রাত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ্জিনকে বলতে নির্দেশ দিতেন, তোমরা ঘরে সালাত আদায় কর।” -সহীহ মুসলিম: ১৬৩২

আরেকটি হাদীসে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ « لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِى رَحْلِهِ ». -صحيح مسلم: 1636

“জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমরা সফরে বের হলাম। বৃষ্টি হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার ইচ্ছা হয়, সে যেন নিজ তাঁবুতে সালাত আদায় করে নেয়।” -সহীহ মুসলিম: ১৬৩৬

এরকম আরো কিছু বর্ননা আছে, যেগুলো উল্লেখ করে অনেককেই বলতে শোনা যাচ্ছে, যেখানে বৃষ্টি কিংবা ঠাণ্ডার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে না এসে ঘরে সালাত আদায় করতে

বলেছেন, সেখানে বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে মসজিদে আসতে নিষেধ করলে কি সমস্যা?

তাদের এ বক্তব্য ঠিক নয়। এখানে আমরা এবিষয়ে খুব সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলে ইমাম নাবাবী রহ.র একটি উদ্ধৃতি দিয়ে কথা শেষ করব। যারা বিস্তারিত দেখতে চান, তারা সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা ফিকহের বড় কিতাবগুলো দেখতে পারেন।

প্রথম কথা হচ্ছে, যাদের জন্য ওজর নিশ্চিত, উক্ত হাদীসগুলোতে তাদেরকে মসজিদে না আসার অনুমতি দেয়া হয়েছে, মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়নি। ওজরের কারণে মসজিদে না আসার অনুমতি দেয়া, আর মসজিদে আসতে নিষেধ করা, মসজিদ বন্ধ করে দেয়া এক কথা নয়। দ্বিতীয় বর্ণনাটির শব্দ থেকেও বিষয়টি পরিষ্কার। যেখানে বলা হয়েছে, যে চায়, সে ঘরে সালাত আদায় করে নিক। একারণেই বাস্তবে দেখা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং পরবর্তী কোনো যুগেই কখনো এমন পরিস্থিতিতেও মসজিদ বন্ধ হয়নি। কোনো একজন আলেমও মসজিদ বন্ধ করতে বলেননি এবং উক্ত হাদীস দিয়ে মসজিদ বন্ধের দলিলও কেউ দেননি।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বাস্তব ওজরের কারণে মসজিদে না আসার অনুমতি দেয়া, আর ওজর প্রমাণিত হওয়া ব্যতীতই শুধু আতঙ্কের কারণে ব্যাপকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এক কথা নয়। যাদের ফিকহ ফতোয়ার সঙ্গে ন্যূনতম সম্পর্ক আছে, তারা সকলেই জানেন, বিষয়গুলোর ব্যবধান আকাশ পাতাল।

তৃতীয়ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কট্টর মুনাফিক ছাড়া কেউই জামাআত ত্যাগ করত না। এমনকি সাধারণ মুনাফিকরাও তাদের নিফাক প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে মসজিদের জামাআত ত্যাগ করার সাহস করত না। ফলে বৃষ্টি কিংবা প্রচণ্ড শীতের ওজরে যাদের মসজিদে না আসার অনুমোদন ছিল, তারাও অনেক বেশি কষ্ট করে মসজিদে আসার চিন্তা করতেন। একারণেই মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের জন্য এই ঘোষণা দিতে হয়েছে। অন্যথায় ঝড় বৃষ্টির মতো পেরেশানির কোনো বিষয় সামনে আসলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই দৌড়ে মসজিদে যেতেন। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর অনুসরণ করতেন। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা সুনির্দিষ্ট কারণ প্রমাণিত হওয়া ছাড়াই কাউকে মসজিদে আসতে বারণ করা যাবে বা মসজিদ বন্ধ করে দেয়া যাবে, এমন কথা প্রমাণ করার চেষ্টা একেবারে অসঙ্গত।

ইমাম নাবাবী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন,

قوله: ‘‘أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، [698] وفي رواية: ‘‘ليصل من شاء منكم في رحله’’، ..... هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الاعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها، وتحمل المشقة؛ لقوله في الرواية الثانية: ليصل من شاء في رحله، ..... – المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ج: 5، ص 207

"তাঁর বক্তব্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে শীত বা বৃষ্টির রাত হলে, মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দিতেন, যেন বলে দেয়, 'তোমরা তোমাদের তাঁবুতেই সালাত আদায় করে নাও'। অন্য বর্ণনায়, যার ইচ্ছা, সে যেন আপন তাঁবুতেই সালাত আদায় করে নেয়। .... উক্ত হাদীসগুলো বৃষ্টি বা এজাতীয় ওজরে জামাতের বিষয়টি হালকা হওয়ার দলিল। কিন্তু ওজর না থাকলে জামাআতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর যে কষ্ট করে আসতে চায়, তার জন্য আসার সুযোগ রয়েছে। কারণ ইবনে আব্বাস রা.র দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, যে চায়, সে আপন তাঁবুতে সালাত আদায় করতে পারে।" -শরহুল মুসলিম: ৫/২০৭

প্রশ্ন–দুই. বর্তমান পরিস্থিতিতে জুমআ পড়ব, না জোহর পড়ব?

উত্তর: জুমআ শরীয়তের অকাট্য বিধান। গ্রহণযোগ্য শরয়ী ওজর ব্যতীত কোনো শাসকের নিষেধের কারণে তা মওকুফ হয় না। এমনকি স্বয়ং ইমামুল মুসলিমিন নিষেধ করলেও না। ইমাম কারদারি রহ. (৮২৭ হি.) বলেন,

نهى الإمام أهل بلدة عن التجمع نفذ حكمه إذا كان بناء على سند شرعي....أما إذا كان بلا سبب شرعي يعتمد عليه كتعصب أو عداوة فلا أثر له فيجتمعون على رجل يجمع بهم –الفتاوى البزازية، ج: 1، ص: 51، ط. دار الفكر

"ইমাম যদি শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে কোনো এলাকার লোকজনকে জুমআ আদায় করতে বারণ করেন, তাহলে তার হুকুম কার্যকর হবে। ... পক্ষান্তরে যদি গ্রহণযোগ্য কোনো শরয়ী দলীল ছাড়া শুধু একগুঁয়েমি বা

দুশমনিবশত নিষেধ করেন, তাহলে তার নিষেধের কোনো মূল্য নেই। লোকজন একজনকে ইমাম বানিয়ে নেবে, যিনি তাদের নিয়ে জুমআ পড়বেন।" –ফাতাওয়া বাযযাযিয়া: ১/৫১

অতএব, যাদের উপর স্বাভাবিক অবস্থায় জুমআ ফরজ, তাদের উপর বর্তমান পরিস্থিতিতেও জুমআ ফরজ এবং তাদেরকে জুমআই আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন-তিন. জুমআ পড়লে কীভাবে পড়ব? আজান, ইকামত ও খুতবা ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিলে ভালো হতো।

প্রশ্ন-চার. জোহর পড়লে কীভাবে পড়ব? জামাআতের সাথে, না একাকী?

উত্তর :

জামাআতের ব্যবস্থাপনা

করোনা সংশ্লিষ্ট যে ১২ শ্রেণির তালিকা দেওয়া হয়েছে, তারা কেউ জুমআয় অংশ গ্রহণ করবে না। এছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় যাদের ওপর জুমআ ফরজ, তারা সবাই জুমআ আদায় করবেন। যাদের সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মসজিদে জুমআ আদায় করার সামর্থ্য আছে, তারা মসজিদেই জুমআ আদায় করবেন। একইভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামাআতও তারা মসজিদেই করবেন।

পক্ষান্তরে নিষেধাজ্ঞার কারণে যাদের পক্ষে মসজিদে জুমআ আদায় করা সম্ভব নয়, তারা খোলা মাঠে, আঙ্গিনায় বা ঘরে—যেখানে সম্ভব জুমআর ব্যবস্থা করবেন। আশপাশের লোকজনকে একটু জানিয়ে দেবেন, এখানে জুমআ হচ্ছে। সংরক্ষিত জায়গায় হলে দরজা খোলা রাখবেন; যাতে কেউ শরিক হতে চাইলে শরিক হতে পারেন। জামাআত বড় হয়ে গেলে এবং প্রশাসনের চাপ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা না থাকলে, ভিন্ন ভিন্ন ইমামের মাধ্যমে ছোট ছোট করে একাধিক জায়গায় একাধিক জামাআতের ব্যবস্থা করবেন।

আজান-ইকামত

জুমআর ওয়াক্ত হলে আজান দিয়ে চার রাকাত সুন্নত পড়বেন। সুন্নত পড়া হয়ে গেলে ইমামের সামনে দ্বিতীয় আযান হবে। আযানের পর ইমাম সাহেব দুই খুতবা দেবেন। খুতবা শেষে ইকামত হবে। ইমাম সাহেব দুই রাকাত জুমআ পড়াবেন। এরপর সকলে চার রাকাত সুন্নত পড়বেন। আগে পরের সুন্নতগুলো চাইলে ঘরেও পড়া যাবে।

মিম্বার, ইমাম ও খুতবা

মিম্বারের ব্যবস্থা হলে ভালো, অন্যথায় চেয়ার হলেও চলবে। ইমাম সাহেব চেয়ারে বসবেন এবং মাটিতে দাঁড়িয়ে খুতবা দেবেন। খুতবা স্বাভাবিক যেভাবে দেয়া হয়, সেভাবেই হবে। মুখস্থ না থাকলে দেখেও দিতে পারবেন। খুতবা বড় হওয়া জরুরি নয়। সংক্ষিপ্ত হলেই ভালো। আরবিতে আল্লাহ তাআলার হামদ, সালাত এবং কুরআনে কারিমের দু-একটি আয়াত হলেও খুতবা আদায় হয়ে যাবে। এমনকি কেউ যদি প্রথম খুতবায় সুরা ফাতেহা এবং দ্বিতীয় খুতবায় সুরা ইখলাস পাঠ করে দেন, তবুও

খুতবা ও জুমআ সহিহ হয়ে যাবে। সঙ্গে দুরূদও পাঠ করে নিতে পারেন। সুতরাং খুতবার জন্য পেরেশানির কিছু নেই।

জুমআর ইমামতির জন্য আলেম হওয়া জরুরি নয়। সাধারণ কোনো দ্বীনদার মুসলিম, যার কেরাত সহীহ এবং সালাতের স্বাভাবিক মাসআলা মাসায়েল জানেন, তিনিও জুমআর ইমামতি করতে পারেন।

কাতারের মাঝে ফাঁকা রাখা

সরকার যেভাবে দুই কাতারের মাঝে এক কাতার ছেড়ে এবং দুই মুসল্লির মাঝে তিন ফিট ফাঁকা রেখে কাতার করার কথা বলছে, স্বাভাবিক অবস্থায় তা মাকরূহে তাহরীমি। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাতে উলামায়ে কেরামের দুটি মত আমাদের সামনে এসেছে। কেউ বলেছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় মাকরূহ হলেও বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তা মাকরূহ হবে না। কেউ বলেছেন, যেহেতু করোনায় আক্রান্তরা এবং যাদের মাঝে করোনার উপসর্গ দেখা দিয়েছে, তারা মসজিদে যাচ্ছেন না; বরং যাদেরকে সুস্থ ধরা হচ্ছে, শুধু তারাই যাচ্ছেন, এবং এলাকাটিও এমন নয়, যেখানে ব্যাপক হারে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং কাতারের মাঝে এভাবে ফাঁকা রাখলে, এখনো তা মাকরূহ হিসেবেই গণ্য হবে। সুস্থদের মধ্যে কেউ আক্রান্ত থাকার যে আশঙ্কা আছে, তা খুবই ক্ষীণ। এমন ক্ষীণ সম্ভাবনা শরীয়তে ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা দলিলের আলোকে দ্বিতীয়োক্ত মতটি অগ্রগণ্য মনে করি। এজন্য যাদের সুযোগ থাকবে, তাদেরকে কাতারের মাঝে ফাঁকা না রেখে; স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিব। তবে কেউ উলামায়ে কেরামের

প্রথম মতটির উপর আমল করে ফাঁকা রেখে দাঁড়াতে চাইলে, তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

উপরোক্ত নিয়মে সুস্থ সকলেই অন্তত চার জন মিলে হলেও জুমআ পড়তে চেষ্টা করবেন। যতক্ষণ জুমআর ব্যবস্থা করা যায়, জোহর পড়বেন না।

যারা অসুস্থ বা জুমআ পড়তে সক্ষম হননি

যাদের কোনোভাবেই জুমআর ব্যবস্থা হল না, কিংবা বর্তমান পরিস্থিতিতে উলামায়ে কেরাম যাদেরকে মসজিদ বা জনসমাগমে না যেতে বলেছেন, অপারগতার কারণে তাদেরকে জোহর পড়তে হবে। তবে জোহর আযান ইকামত ছাড়া একাকি আদায় করবেন, জামাআত করবেন না। কারণ যেখানকার লোকজনের উপর জুমআ ফরয, সেখানকার যারা ওজরের কারণে জুমআয় শরীক হতে পারেননি, তাদের জন্য জোহরের সালাতে জামাআত করা নিষেধ। তদ্রূপ, মা'জুরদের জন্য মুস্তাহাব হল, জুমআর সালাত শেষ হওয়ার পর জোহর শুরু করা। জুমআর সম্মানার্থে এ বিধান।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত বিধান শুধু জুমাবারের জোহরের সালাতের জন্য। আসরের সালাত থেকে অন্য সকল সালাত স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আযান ইকামতসহ জামাতে পড়তে পারবেন। জুমআর সম্মানার্থে শুধু সেদিনকার জোহরের সালাত ব্যতিক্রম।

এই বিষয়গুলো সালাতের স্বাভাবিক সময়ের স্বাভাবিক ও স্বীকৃত মাসায়েল। এজন্য দলিল ও উদ্ধৃতি উল্লেখ করে কলেবর বৃদ্ধি থেকে বিরত থাকলাম।

ইযনে আম : একটি সংশয়

এখানে সংশয় হতে পারে যে, জুমআর জন্য ইযনে আম তথা ব্যাপক অনুমতি শর্ত। সুতরাং জুমআর জামাআতে সকলের অংশ গ্রহণের অনুমতি না থাকলে জুমআ সহিহ হবে কিভাবে?

এ ব্যাপারে কথা হলো, জুমহুর আইম্মার মতে ইযনে আম শর্ত নয়। আর হানাফি আইম্মায়ে কেরাম যারা ইযনে আম শর্ত বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্য, যারা জুমআ পড়বে, তারা কোনো ওজর ছাড়া অন্যদেরকে জুমআয় শামিল হতে বাধা দিতে পারবে না। যে চায় শামিল হওয়ার অনুমতি থাকবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইযনে আম থাকতে হবে এমন নয়। বরং আমরা দেখেছি, শরয়ী কারণ ছাড়া রাষ্ট্র বাধা দিলেও জুমআ ছাড়া যাবে না।

বিষয়টি যদি এমন হয় যে, কোনো ব্যক্তির জুমআয় অংশ গ্রহণে তাদের কোনো আপত্তি না থাকে, তবে অন্য কোনো ওজরের কারণে নিষেধ করতে হচ্ছে, তবে তা ইযনে আমের পরিপন্থী হবে না। যেমন মনে করুন, একটি কাঠের মেঝেতে জুমআর সালাত আদায় করতে হচ্ছে। যাতে দশজনের বেশি উঠলে তা ধ্বসে পড়তে পারে। সুতরাং এখানে দশজনের অধিক লোককে জুমআ আদায় করতে নিষেধ করলে, তা ইযনে আমের পরিপন্থী হবে না এবং জুমআর বিশুদ্ধতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করবে না। ‘মাজমাউল আনহুর’ গ্রন্থকার কাযি আব্দুর রহমান শায়খি যাদাহ রহ. (১০৭৮ হি.) বলেন,

والإذن العام وهو أن يفتح أبواب الجامع للواردين ... وما يقع في بعض القلاع من غلق أبوابه خوفا من الأعداء أو كانت له عادة قديمة عند حضور الوقت فلا بأس به لأن إذن العام مقرر لأهله ولكن لو لم يكن لكان أحسن كما في شرح عيون المذاهب وفي البحر والمنح خلافه لكن ما قررناه أولى لأن الإذن العام يحصل بفتح باب الجامع وعدم المنع ولا مدخل في غلق باب القلعة وفتحه ولأن غلق بابها لمنع العدو لا لمنع غيره تدبر وعند الأئمة الثلاثة لا يشترط الإذن العام –مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ج: 1، ص: 246، ط. دار الكتب العلمية

“(আরেকটি শর্ত হচ্ছে) ইযনে আম। আর তা হলো, আগন্তুকদের জন্য জামে মসজিদের দরজাসমূহ খোলা রাখা। ... কোনো কোনো কেল্লায় শত্রুর ভয়ে বা পুরাতন রীতি অনুযায়ী জুমআর ওয়াক্তে যে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, এতে কোনো সমস্যা নেই। ... কারণ, বন্ধ করা হচ্ছে শত্রু প্রতিহত করার জন্য, অন্যদের (তথা মুসল্লিদের) বাধা দেয়ার জন্য নয়। আর ইমামত্রয় (ইমাম মালেক, ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমাদ রহ.)-এর মতে ইযনে আম শর্ত নয়।” –মাজমাউল আনহুর: ১/২৪৬

এ জন্যই দেওবন্দ ও বিন্নুরি টাউনের দারুল ইফতাসহ; আরব-আজমের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম বর্তমান পরিস্থিতিতে ছোট ছোট জামাআতে হলেও জুমআ আদায়ের নির্দেশনা দিয়েছেন।

فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (হাফিযাহুল্লাহ)

১৪ রমজান, ১৪৪১ হি.

০৮ মে, ২০২০ ইং

اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ